প্রকাশক :
শ্রীরথীন্দ্রনাথ বিশ্বাস
৮এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : চৈত্র, ১৩৩৯

প্রচ্ছদ : শচীন বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
শ্রীগঙ্গারাম পাল
মহাবিদ্যা প্রেস
১৫৬, তারক প্রামাণিক রোড
কলিকাতা-৬

মূল্য : চার টাকা মাত্র

সত্যজিৎ রায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

॥ ক ॥

'প্রতিহারী, রাখো মোর অনুরোধ! বাতায়ন করো না রুদ্ধ। একটিমাত্র বাতায়ন। খুলে দাও। দাও খুলে। আলোকের স্পর্শ নয়। বায়ুর হিল্লোল নয়। বুদ্ধের দর্শন লভি জীবনের অপরাহ্নকালে মৃত্যুকে করিব বরণ। এই মোর স্বপ্ন। এই মোর অভিলাষ। দেবকান্তি পুরুষের সান্নিধ্য করেছিনু কামনা। তার চরণ স্পর্শ করি হব ধন্য। সব ব্যর্থ হলো। গিরিব্রজ, বসুমতী, বৃহদ্রথপুর, কুশাগ্রপুর, রাজগৃহ যে নামে আহ্বান করো ক্ষতি নেই। সেই নগরীর অধীশ্বর আমি। নিয়তির ছলনা। আজ পুত্র হাতে বন্দী আমি। মগধেশ্বরের এ কি পরিণতি!

রাখো, রাখো মোর একটি মিনতি! অবলোকন করিব আমি বুদ্ধের পাদচারণা ওই গৃধ্রকূট পাহাড় কন্দরে। বৈভার, বিপুলাচল, রত্নগিরি, উদয়গিরি, স্বর্ণাগিরি। এই পঞ্চপর্বত বেষ্টিত রাজগৃহ। প্রতিটি প্রস্তরখণ্ড বুদ্ধের চরণস্পর্শে হয়েছে ধন্য। পুণ্যময়। পবিত্র এর প্রতি ধূলিকণা। রত্নগিরি উদয়গিরি মাঝে এ গৃধ্রকূট। শিষ্য আনন্দকে নিয়ে বুদ্ধ থাকে যেথা আনন্দমগন।

—প্রতিহারী, মোরে নিয়ে চলো একবার গৃধ্রকূট পাহাড়ে। ক্যাশাপায়ন গুহায়। যেখানে আনন্দ মদ্গল্ শোনে অহর্নিশি বুদ্ধের বাণী। জানো না কি কতো প্রভাত-সন্ধ্যায় গৃধ্রকূটে বসি বুদ্ধের অমৃত উপদেশাবলী আমি করেছি শ্রবণ!

শাক্যপুত্র গৌতম, বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে, শান্তির সন্ধানে, বৈভব সম্পদ সব পায়ে দলে এসেছিলেন এই রাজগৃহে বিখ্যাত পণ্ডিত অলর আর উদকবামাপুত্রের কাছে কিছুদিন অধ্যয়নের তরে। সেদিন আমি করেছিনু বরণ নগরের শ্রেষ্ঠ পুরুষকে। মুকুট পরায়েছিনু তাঁর শিরে। প্রতিজ্ঞা করেছিলেন তিনি, একদিন ফিরিবেন এ নগরীতে নিজ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার পরে। এলো

ফিরে সেই তাপস-তনয়। মুণ্ডিত-মস্তক, সৌম্যকান্তি পুরুষ ফিরে এসেছিলেন শাক্যপুত্র গৌতম রূপে নয়, এসেছিলেন ভগবানে তথাগত বুদ্ধ রূপে। দিতে মুক্তি মানব-সন্তানকে। আর দিতে চেয়েছিলেন পথের সন্ধান। নিজে লাভ করেছিলেন পরম শান্তি। দেহ থেকে বিচ্ছুরিত হয়েছিলো কি অপূর্ব লাবণ্য-ছটা! আজও সে জ্যোতি রয়েছে অম্লান।

—প্রতিহারী, রাখো, রাখো মোর একটি মিনতি! শৃঙ্খলাবদ্ধ শার্দুলকে কারাগার হতে দাও মুক্তি। তবু নিরুত্তর! নিশ্চল পাথর তুমি! আমার প্রস্তাব শুনি ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত তুমি! জানো না কি কে গড়েছে এ রাজগৃহ? বিম্বিসার। বিম্বিসার। মগধ অধিপতি রাজা বিম্বিসার। বিম্বিসার গড়েছে এ নগরী। গড়েছে তার প্রতিটি রক্তবিন্দু দিয়ে। সহস্র সহস্র গগনচুম্বী অট্টালিকা শোভিত এ নগরী। মগধ রাজবংশের শ্রেষ্ঠ অবদান। প্রশস্ত রাজপথ। কমলিনী ভূষিত সরোবর। নৃত্যগীত মুখরিত প্রমোদ-ভবন। পণ্যসম্ভারে পরিপূর্ণ পণ্যশালা। দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠী, বণিকের আগমনে চঞ্চল, ব্যস্ত এ নগরী। ঐশ্বর্য, বিলাস, বৈভব, শৌর্য, বীর্যে পরাক্রান্ত এ নগরী। সদা উৎসবমুখর। রামায়ণ-খ্যাত বসুমতী, মহাভারতের বৃহদ্রথপুর হতে কোনো অংশে হীন নয় এ রাজগৃহ। মগধ-বীরের দীপ্ত পদক্ষেপে কেঁপে উঠেছিলো অরণ্য-প্রান্তর। অশ্বের হ্রেষারবে আর তুর্য-নিনাদে অরণ্য-পশুরা ছিল সদা ভীত আর চকিত। ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি—আর সভ্যতা। কোনো অংশে অন্য কোনো নগরী হতে হীন নয়—এ মহানগরী।

সমগ্র উত্তর ভারতে ষষ্ঠদশ রাজ্যের ভিতর সর্বশ্রেষ্ঠ মগধ রাজ্য, আর সর্বশ্রেষ্ঠ এ নগরী। প্রতিহারী, আমাকে নিয়ে চলো নগরের মাঝে। এখনো কি রাজপ্রাসাদ হতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হয় নির্গত? স্বর্ণ-মণিমুক্তা দিয়ে তৈরী পালঙ্কের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণালী পোশাকে ভূষিতা পরিচারিকার দল পথ চলে চামর দুলিয়ে, সঙ্গে চলে নৃত্য-

পটিয়সীর দল? নৃত্য-আরাধনায় রত থাকে যারা সর্বক্ষণ? স্বর্ণ-রৌপ্য পাত্র হতে সুগন্ধি নির্যাস যারা ছড়ায় ক্ষণে ক্ষণে?

—প্রতিহারী, একবার মুক্ত করে দাও মোরে! আমি যাবো গৃধ্রকুট পাহাড় অঞ্চলে। যাবো সেখানে, যেখানে ভগবান বুদ্ধদেবের দুই প্রধান শিষ্য, শারীপুত্র আর মহা মোগল্লায়ন করেছিলেন ভগবান বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ।

নয় তো নিয়ে চলো মোরে জীবকের আম্রকুঞ্জে। সুবিখ্যাত চিকিৎসক জীবক। আমার পরম সুহৃদ। জানো না কি চিকিৎসক বিনে নৃপতির চলে না মুহূর্তকাল? জীবক! জীবক, রাজ চিকিৎসক। রয়েছে সে কি এখনো জীবিত? ছলে বলে কৌশলে অজাতশত্রু কি হত্যা করেনি তাকে এখনো? প্রতিহারী, নিয়ে চলো মোরে সপ্তপর্ন্নি গুহা, পিপলি গুহা আর ইন্দসিলা গুহায়!

শুনতে পাও না কি রথচক্রের ঘর্ঘর-ধ্বনি? শোনো, শোনো, কান পেতে শোনো! কে? কে?—পুত্র অজাতশত্রু! প্রাণাধিক পুত্র আমার! আজ তুমি বিদ্রোহী। তব হৃদয়ে পিতৃরক্তে তর্পণের বাসনা! না। না। অগ্নিক্ষরা চক্ষু দেখি কম্পিত নয় আমার এ হৃদয়। নৃপতি বিম্বিসার ভীত নয় রক্তবর্ণ চক্ষু দেখি। পুত্র, তুমি কি এসেছো রত্নভাণ্ডারের সন্ধানে? অসম্ভব। অসম্ভব প্রস্তাব। পাবে না তুমি তার সন্ধান। সারা রাজগৃহে একটিমাত্র প্রাণী রাখে সে সন্ধান। সে আমি। সে আমি। যক্ষরা পাহারা দেয় ওই রত্নরাজি। প্রতিহারী, নিয়ে এসো ত্বরা করি ত্রিশূল, খড়্গ, চক্র, গদা, ধনুক, কুঠার, যাহা পাও হস্তের সম্মুখে। এ মুহূর্তে অকৃতজ্ঞ, পাপিষ্ঠ পুত্রের শির ধূলায় লুটাবে।

না। না। সে নহে সম্ভব। প্রাণাধিক পুত্রকে স্বহস্তে নিধন করা হবে না সম্ভব। পুত্রের শির দেহ হতে বিচ্যুত হবে! অসম্ভব। সে অসম্ভব। অজাতশত্রু পুত্র মোর! কখনো কোনো সাধ যার রাখিনি অপূর্ণ। অজাতশত্রু! হে পুত্র, তোমারই আদেশে বন্দী আমি। হয়েছি নিক্ষিপ্ত এ কারাকক্ষে।

পুত্র, কেন তব এ অশোভন আচরণ? কৃতবিদ্য, সর্বশাস্ত্র-বিশারদ, চারুদর্শন যুবরাজ দেবব্রতের ত্যাগ-কাহিনী শোনোনি কি তুমি? হাসিমুখে রাজ্যাধিকার যিনি করেছেন ত্যাগ। বরণ করেছেন যিনি চির কৌমার্যব্রত। ভীষ্ম উপাধিতে হলেন ভূষিত। পিতৃসত্য পালনের তরে রামচন্দ্র করেছেন বনগমন। এ সব মহান আদর্শ রয়েছে সম্মুখে তোমার। তবু পুত্র তুমি ক্ষণেকের তরে হওনি কি বিচলিত?

না। না। এ আমার কি সব অলীক কল্পনা! করেছি আমি এক প্রকাণ্ড ভুল। অজাতশত্রুর কখনো হবে না আগমন এ পরিত্যক্ত, জনবিরল কারাকক্ষে।

তুমি? তুমি কে? ও, বুঝেছি, রাজকার্যে রত গোপন্ তথ্য সংগ্রহকারী পুরুষ কোনো! হয়তো অজাতশত্রু গুপ্তচর করেছে প্রেরণ।

না। না। ভুল। মহাভুল। ঘনীভূত অন্ধকার যেন মনুষ্যরূপ করেছে ধারণ। ব্রাহ্মণের চক্রান্তজালে অজাতশত্রু হয়েছে আবদ্ধ। ব্রাহ্মণেরা বলে রাজগৃহে ধর্ম, সভ্যতা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি, ঐতিহ্য হয়েছে নাকি আজ পদদলিত। বৌদ্ধধর্মের প্রসারণে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নাকি হয়েছে অমর্যাদা। আজ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম হয়েছে বিপন্ন।

ছোট-বড়ো ভেদাভেদ নাকি হয়েছে চূর্ণ। যাগযজ্ঞের বিধান নাকি হয়েছে লণ্ডভণ্ড। তাতেই ব্রাহ্মণেরা হয়েছে ক্ষিপ্ত। তাই তারা রোষবহ্নি ছড়ায় চতুর্দিকে। তারা বলে বেদ নেই। ব্রাহ্মণ নেই। হিন্দুর দেবদেবী অপমানিত, পর্যুদস্ত। বলিদান হয়েছে বন্ধ। তাদের অভিযোগ, অহিংসা কেন পেয়েছে প্রশ্রয়? সর্বজীবে ভালোবাসা অসহ্য তাদের কাছে। উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণের দর্প অহঙ্কার ভূপতিত, ধূলায় লুণ্ঠিত। তাই ব্রাহ্মণের দল করেছে চক্রান্ত। অজাতশত্রুকে করেছে ক্ষিপ্ত বৌদ্ধধর্মের প্রতি। ওদের চক্রান্ত-জালে আবদ্ধ আজ প্রাণাধিক পুত্র অজাতশত্রু। তাই পিতাকে সে করেছে সিংহাসনচ্যুত, কারাগারে করেছে নির্বাসিত। অজাত-

শক্র আবদ্ধ আজ ব্রাহ্মণের যুক্তিজালে। বৌদ্ধধর্ম এনেছে এক বিরাট প্লাবন। আর বাধার প্রাচীর সৃষ্টি করেছে বেদ আর ব্রাহ্মণেরা। স্বেচ্ছাচারীর দল পেতেছে চক্রান্তজাল অতি সঙ্গোপনে। শোনা যায় বুদ্ধদেব নাকি হবেন নির্বাসিত গৃধ্রকূট হতে।

বিম্বিসার কখনো সহ্য করবে না দুরাত্মার এ পাপাচার। এ ছলকলা। এ অশোভন আচরণ। রাজকুমার সিদ্ধার্থ হয়েছেন আজ বুদ্ধদেব নামে পরিচিত। কাশী, গয়া, কোশল আর মগধের নরনারী সকল যাঁর চরণের ধূলিকণা স্পর্শ করে ধন্য হয়। হয় কৃতার্থ। কোশল নৃপতি প্রসেনজিৎ, আর মগধ নৃপতি বিম্বিসার যাঁর পাদস্পর্শের জন্যে প্রতিমূহূর্তে হয়ে ওঠে ব্যাকুল আর চঞ্চল। নূতন এ ধর্মের উন্মাদনা যাদের শিরায় শিরায় হয় প্রবাহিত। উত্তর ভূখণ্ডের দুই প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতি যে ধর্মের প্রতি হয়েছে অনুরক্ত, সে ধর্মের প্রতি যদি হয় কোনো অসৎ আচরণ, হবে তা অসহ্য ওই নৃপতিদ্বয়ের কাছে।

—প্রতিহারী, শুনেছি এ রাজগৃহের হয়েছে অনেক অধঃপতন। রাজ-রক্ষিতার দল ব্যাধি নিয়ে করে কুণ্ডে অবগাহন। উষ্ণ প্রস্রবণ তাই আজ হয়েছে কলুষিত, অপবিত্র, অশুচি। জুয়া, সুরা, চৌর্যবৃত্তি, দেহলালসা সব পেয়েছে প্রশ্রয়। বৌদ্ধমঠ নাকি রূপান্তরিত হয়েছে বারবণিতার বিলাসভবনে। মঠে, বিহারে শ্রুত হয় রমণীর চরণোত্থিত নূপুর-নিক্কণ। অজাতশক্র কি এখনো অবগত হয়নি বিশৃঙ্খলার এ নিঃশব্দ পাদচারণ? জানে না কি সে গহন ঘনঘটা জমেছে দিক্-চক্রবালে?"

* * * *

রাজগীরে রেলওয়ে কলোনীর বাংলোগুলোর পাশেই রেস্ট হাউস। তারই বারো নম্বর ঘরে একলা বসে সুপ্রিয় রিহার্সাল

দিচ্ছিলো। গোটাদলের বাকী সবাই সারাটা সন্ধ্যে রিহার্সাল দিয়ে বিদায় নিয়েছে। তারা সবাই থাকে কলোনীর বাংলোগুলোতে। সুপ্রিয় আর ডাইরেক্টর শুধু থাকে এ রেস্ট হাউসে। ফিল্ম সুটিং-এর উদ্দেশ্যে গোটা দলটা কয়েকদিন হয় এখানে এসে পৌছেছে। ইতিহাস মন্থন করে, ফেলে-আসা বহু পুরানো যুগের কাহিনীর ওপর নির্ভর করে স্ক্রিপট্ লেখা হয়েছে। দলের সবাইকার ইচ্ছে রাজগীরের গিরি-কন্দর বন-প্রান্তরে ঘুরে ঘুরে ফিল্মের জন্যে সটস্ নেওয়া হবে। সুটিং-এর কাজকর্ম সব এখানেই শেষ করতে হবে। সপ্তাহ তিনেক থাকতে পারলেই সব কাজকর্ম গুছিয়ে নিয়ে ওরা কলকাতায় ফিরে যেতে পারবে। বিম্বিসারের বিরাট সলিলকি নিয়ে মহা ফ্যাসাদে পড়েছিলো সুপ্রিয়। বার বার পাঠ করেও সুপ্রিয় যেন রোলটাকে ঠিক রপ্ত করতে পারছিলো না। এমন সময় ঝড়ের বেগে তার ঘরে টুন্ টুন্ প্রসাদ এসে ঢোকে। ছোট্ট একটি সংবাদ—পাঁচ নম্বর ঘরে সিলিং থেকে দড়ি ঝুলিয়ে সেই দড়ির ফাঁসে গলা দিয়ে ক্ষ্যাপাদিদি ঝুলছে!—সর্বনাশ! সাংঘাতিক খবর! সুপ্রিয় এখানে পৌছুবার পর ক্ষ্যাপাদিদি সম্বন্ধে দু'চারটে টুক্‌রো কথা উড়ে এসে তার কানে পড়েছিলো। পাগলাটে ধরনের দিদিমণি নাকি সারাটা দিন মদ গিলে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে। সুপ্রিয় ক্ষ্যাপাদিদিকে দেখেনি। তবে তার কথা শুনেছিলো। সর্বনাশ, সে কি কথা! ক্ষ্যাপাদিদি আত্মহত্যা করলো! এখানে পৌছুতে না পৌছুতে একি দুঃসংবাদ! সব ফেলে সুপ্রিয় ছুটলো। ছুটলো পাঁচ নম্বর ঘরের দিকে। স্ক্রিপট্ পড়া মাথায় উঠলো।

বীভৎস কাণ্ড! ক্ষ্যাপাদিদিকে মাটিতে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একি! একঝলক দৃষ্টি বর্ষণ করতেই সুপ্রিয় চম্‌কে ওঠে। শিউরে ওঠে। কেঁপে ওঠে। কঁকিয়ে ওঠে। হৃদয়টা মোচড়ায়। আঁচড়ায়। দাপড়ায়। হৃৎপিণ্ডের গতি স্তব্ধ হবে নাকি? পৃথিবীটা কি আরো জোরে ঘুরছে? না, তার মাথা ঘুরছে? স্মৃতির জলে ঘূর্ণি উঠেছে? হাওয়ায় কি সাইক্লোনের আভাষ? আকাশের

তারারা কি ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হচ্ছে? মনে হচ্ছে পিছু হটছে বড্ডো তাড়াতাড়ি। ওরা কাকে ক্ষ্যাপাদিদি বলছে! এ যে সুপ্রিয়র অতি পরিচিত মিনতিদি। বহুকাল আগে ছ'জনার পরিচয় ছিলো অতি প্রগাঢ়।

মিনতিদির লাঞ্ছিত, বহু বিড়ম্বিত, পানোন্মত্ত দেহটা পড়ে রয়েছে। নিশ্চল, নীরব। এ কি দেখলো সুপ্রিয়! কেন দেখলো? না দেখলে কি চলতো না? বহুকাল আগে শিলং-এ দেখা মিনতিদি তাহলে রাজগীরে এসে ক্ষ্যাপাদিদি নাম নিয়েছে! বহুদিনের অদর্শনে সুপ্রিয় মিনতিদিকে প্রায় ভুলে ছিলো। বেশ ছিলো সে। কিন্তু পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার আগে মিনতিদি তাকে শেষ দেখা দিয়ে গেলো। দেখা দিক্, ক্ষতি নেই। কিন্তু এ অবস্থায় তাকে দেখতে হবে কখনো ভাবেনি সে। সুপ্রিয় ছ'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললো। তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। চোখে জল নেই। কান ঝাঁ-ঝাঁ করছে। আশেপাশে শুধু গুঞ্জন। লোকদের কথাবার্তা। কিন্তু কোনো কথার অর্থই তার কাছে স্পষ্ট নয়।

ক্ষ্যাপাদিদির কানের পোখরাজ ছুটো জ্বলছিলো। তার চোখের কোণে রক্ত জমেছে। জিভ বেরিয়ে পড়েছে। লোকজনেরা মিনতিদির দেহটা ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে গেলো। দেহটা জীপে তুলে হাসপাতালের পথে গাড়ি ছুটবে। মিনতিদিকে ওরা যেখানে ইচ্ছে নিয়ে যাক্। সুপ্রিয় দৃষ্টি ফেলেই বুঝেছিলো মিনতিদি আর বেঁচে নেই। সুপ্রিয়র অন্তরের ব্যথাটা পাক খেয়ে ওপরের দিকে উঠছে। ওরা দেহটা জীপে তুলে ফেলেছে। এ ঘরে ছ'চারজন লোক। কারো মুখে কথা নেই। হিমশীতল চাঁদটা যেন থমকে চেয়ে আছে। পাহারাওয়ালার বুটের শব্দ। মৃত্যুকেও যেন ও শব্দ পরোয়া করে না। বড্ডো দাম্ভিক।

সুপ্রিয়র মনটা বড্ডো ভারাক্রান্ত, জনপদ থেকে মনটা অরণ্যের পথে চলে যেতে চায়। অরণ্য আজ যেন বড্ডো পরিচিত। হাতছানি দিয়ে ডাকছে আর ডাকছে। সভ্য সমাজ থেকে

অরণ্য ভালো। ওদিকে এলোমেলো পাহাড়ের সারি। সুপ্রিয়র মগজে এলোমেলো চিন্তা। মৃত্যুর ছায়া যেন রেস্ট হাউসের সারাটা অঙ্গে লেপ্‌টে রয়েছে। ক্ষ্যাপাদিদি ওরফে মিনতিদির উন্নত পীন পয়োধর, মুখে পাউডার-স্নো-এর পুরু প্রলেপ। ওগুলো সম্বল করে বয়সের সঙ্গে মিনতিদি আপ্রাণ যুদ্ধ করেছে। তবু গালের রেখাগুলো ঢাকতে পারেনি। কে যেন পাশ দিয়ে যাবার সময় বলে গেলো—"A lady of easy virtue" সুপ্রিয়র কানের ভেতরে কে যেন তপ্ত শলাকা ঢুকিয়ে দিলো। অসহ্য! একটা আর্তনাদ মুখ দিয়ে না বেরিয়ে বুকের ভেতর সবেগে দাপড়াচ্ছে। অন্তরের গভীর গহন কোণে যন্ত্রণা মাথা কুটছে।

সুপ্রিয় ভাবে মিনতিদি এভাবে সুইসাইড না করলেই পারতো। সায়ানাইড খেয়ে মরতে পারতো। ফলিডল্ বিষ খারাপ নয়। ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা! কি সাংঘাতিক! ভাবা যায় না। ভয়াবহ, নির্মম, করুণও বটে। এরই ভেতর অপদার্থ পাখীটা ডেকে ওঠে—"বউ কথা কও।" পাখীটার কোনোরকম জ্ঞানগম্যি নেই। এ কি বউদের কথা বলবার সময়! না, কথা বললেও শুনতে ভালো লাগে! মিনতিদি আর কোনোদিন কথা বলবে না। ডাগর চোখ মেলে তাকাবে না। রাজগীরের রেস্ট হাউসে সুপ্রিয় মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকে।

॥ খ ॥

অজাতশত্রু স্তূপের কাছে এসে থেমে যায় টমটমের ঘোড়াটা। —"শালা বেয়াকুব!" জ্বলন্ত অঙ্গার-দৃষ্টি ছুঁড়ে মারে ছোটেলাল। ধুঁক্‌ছে ভুগ্‌ছে ঘোড়াটার দিকে তাকায় একবার। আর একবার ট্যুরিস্ট্ বাসটার আপাদমস্তকে জ্বলন্ত দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়। বাসের ড্রাইভারের সীটে বসে সিটি বাজায় ঘন-ঘন রসিকলাল। বেশি বেশি করে বাজায়। সম্ভবতঃ সড়কের কচি-কাঁচা মেয়েটার উদ্দেশে।

ছোটেলালের দিকে তাকিয়ে অবজ্ঞাসূচক দৃষ্টি হানে। চিরিক্ করে থুথু ছোঁড়ে পথের ধুলোর ওপর। তারপর একরাশ ধুলো উড়িয়ে, ইঞ্জিনে বিকট গর্জন তুলে বাসটা চলে যায়। যাবে রাজগীর থেকে নালন্দা, পাওয়াপুরী আর গয়া। যাত্রী বোঝাই বাসটা চলে যায় রুগ্ন, মৃতপ্রায়, ধুঁক্‌ছে ভুগ্‌ছে ঘোড়াটার হাড়-পাঁজরে কাঁপুনি তুলে। ছোটেলালের চোখদুটো ধক্‌ধক্ করে জ্বলে, হিংস্র এক উন্মাদের দৃষ্টি ফেলে সবকিছু দেখে ছোটেলাল। কিন্তু রুগ্ন, পঙ্গু ঘোড়াটার মতোই তার চোখে অসহায় দৃষ্টি। আর কতোকাল যুঝ্‌বে ছোটেলাল? প্রথমে এলো হাতে-টানা রিক্‌শা। তারপর সাইকেল রিক্‌শা। এখন বাস, আর হালে ট্যাক্সিও এসে গেছে। অনেকগুলো বছর আগে ছোটেলাল যখন টম্‌টম্ চালাতো তখন এসব কিছুই আসেনি। রেষারেষি ছিলো পাল্কীর সঙ্গে।

না, ছোটেলাল আর পেরে উঠছে না। নিজেরই দানাপানি জোটে না। তার ওপর আবার ঘোড়ার দানাপানি! তাও যদি ঘোড়াটা সওয়ারী নিয়ে পক্ষীরাজের মতো ছুটতো। সুপ্রিয়কে গাড়িতে বসিয়েছিলো ছোটেলাল অনেক আশা নিয়ে। কিন্তু ঘোড়াটা একটা ষাঁড়কে পথ আগলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। ব্যস্! ভয়ের চোটে নড়ছে না এক পা। সড়কের মাঝে বেমক্কা আটকে গিয়ে গোঁ চেপেছে ছোটেলালের। খামোকা খামোকা জ্বালাচ্ছে ঘোড়াটা। ওর ব্যবহারে গা-পিত্তি জ্বলছে ছোটেলালের। ঘন ঘন চাবুকটা সে হাঁকড়াচ্ছে। মুখ থেকে নানা রকম উৎকট শব্দ বার করছে। কিন্তু ঘোড়াটারও গোঁ চেপেছে। নড়বে না এক পা। দূর ছাই! টম্‌টমের ঘোড়াটা বেচে দেবে ছোটেলাল। গাড়িটার কাঠ পুড়িয়ে চাল সেদ্ধ করে ভাত পাকাবে।

সুপ্রিয় বসে বসে চারদিকের সব কিছু দেখছে। করবার আছেই বা কি! বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রু রাজগীরের দক্ষিণ দিকে নূতন রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। দৈর্ঘ্য তিন মাইল ও সতেরো কি

আঠারো ফুট উঁচু প্রাচীরের নির্মাণকার্য চলেছিলো খ্রীষ্ট-পূর্ব পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিম্বিসার ও অজাতশত্রুর রাজত্বকালে। অজাতশত্রুর মৃত্যুর পর মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর পুত্র উদয়ন। রাজগীরের পুরোনো কাহিনী সুপ্রিয়র জানা আছে।

উদয়নের রাজত্বকালে পাটলিগ্রামে গড়ে ওঠে মগধ সাম্রাজ্যের নূতন রাজধানী পাটলিপুত্র। বর্তমানের পাটনা। সুপ্রিয় ভাবে কতো নৃপতি, সম্রাট, বাদশাহ আর সুলতান তাঁদের রাজধানী সরালেন। মুহম্মদ বিন্-তুঘলক্ দিল্লী থেকে সাতশো মাইল দূরে দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কয়েক বছর পর তিনি আবার দিল্লীতে রাজধানী উঠিয়ে আনেন।

মুঘলসম্রাট আকবর সিক্রিতে নূতন নগরীর পত্তন করেন। আগ্রা থেকে ছাব্বিশ মাইল দূরে ফতেপুরসিক্রি। জল সরবরাহের অপ্রতুলতার জন্যে সিক্রি শেষ পর্যন্ত ছেড়ে আসতে হয়। ফরাসী-রাজ চতুর্দশ লুই ভার্সাইতে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যান। পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত হবার পর ধীরে ধীরে মৃত্যু হলো রাজধানী-রূপী রাজগৃহের। রাজগৃহ হলো হতশ্রী। ইতিহাসের সাক্ষ্য বহনকারী প্রাচীন রাজগৃহের ধ্বংসাবশেষ পড়ে রইলো। কিন্তু না, বেঁচে রইলো রাজগৃহ। বেঁচে রইলো মহানগরীর শাশ্বত আত্মা।

সুপ্রিয় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইস্‌লাম তীর্থের সমন্বয় সাধনে সক্ষম রাজগীরের প্রতিটি ধূলিকণায় ইতিহাস আর ইতিহাস। ভগবান তথাগত বুদ্ধদেবের পাদস্পর্শে পবিত্র এই রাজগীর। ভগবান বর্ধমান মহাবীরের পদচিহ্ন আঁকা রয়েছে এই রাজগীরের পাথরে পাথরে। ইস্‌লামের সিদ্ধপুরুষ মখ্‌দুম শাহের তপস্যাপূত রাজগীর। বাল্মীকি রামায়ণে কুশ নামক রাজার পুত্র বসু পঞ্চপর্বতের মধ্যে গিরিব্রজ নামক নগর স্থাপন করেন। রাজা বসুর নামানুসারে এই নগরী বসুমতী নামে বিখ্যাত ছিলো।

সুপ্রিয় তাকিয়ে তাকিয়ে চারদিকটা দেখে নেয়। প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহশালা বিভাগ খননকার্য চালিয়ে যাচ্ছে। নবাবিষ্কৃত প্রাচীন-

লিপি, প্রমাণপঞ্জী, সোপান আর দেয়াল গাত্রে গাত্রে সব জড়িয়ে রয়েছে। গরম জলের কুণ্ডের পথে যাত্রীর দল চলেছে। বাত-ব্যাধিতে প্রায়পঙ্গু এক বৃদ্ধাকে ডুলিতে চড়িয়ে ঝুলিয়ে নিয়ে কুণ্ডের পথে যাত্রীদল চলেছে। এদিকে ছোটেলাল চাব্‌কে চাব্‌কে ঘোড়ার ঘেঁয়ো পিঠটা লাল করে দিয়েছে। মিষ্টির দোকানের পচাকে দেখে চেঁচায় ছোটেলাল—"পচা, যাচ্ছিস্ কোথায় ?"

—"কুণ্ডের জলে ডুইব দিয়া আইস্‌বো।" বলে পচা।

—"শালা ভুগ্‌ছে খারাপ রোগে। জলের দফা সারা। কুণ্ড অপবিত্র করবার মতলব!" নিজ মনে গোঙায় ছোটেলাল।

হঠাৎ কোথা থেকে একটি মেয়ে প্রায় দৌড়ে এসে ছোটেলালের জামাটা খিম্‌চে ধরে।

—"কালরাতে ঘরে ফিরলি না কেন রে ?"

—"এই ছাড় বলছি! জামাটা ছিঁড়ে যাবে। আমার বস্‌রার গোলাপ!" সোহাগে ডোবানো হাতখানা ছোটেলাল বুলোয় ছুঁড়িটার পিঠে বুকে মাজায়।

—"ইস্, সোহাগ কতো!" ঝাম্‌টা মারে মেয়েটা। সোহাগসুদ্ধ হাতখানা ঠেলা দিয়ে সরিয়ে দেয়।—"সারাটা সন্ধ্যে হা-পিত্যেস্ করলাম তোর জন্যে। ঘরে একটি কানাকড়িও ছিলো না।"

—"গতকাল সন্ধ্যে বেলা রাজগীরে ছিলাম না। রাতটা নালন্দায় থেকে গেলাম। আরে, বেটি দেখছি আঁচড়ে কামড়ে আমাকে নাহেজাল করে ছাড়ছে!" মেয়েটা রাগে ফুঁস্‌ছে। সুপ্রিয়কেই ছাড়িয়ে দিতে হয়।

—"নালন্দায় অনেক মজা! তা দানাপানির জন্যে পয়সা ফেলে যাবি তো!" নিতম্বভারে প্রপীড়িতা নারী। যৌবন রসে দাড়িম্ব-আঙ্গুরের মতো টুইটুম্বর। আর এদিকে ছোটলালের ভেঙে-চুড়ে সব তুবড়ে গেছে।

—"দেখেছিস্ বাবু! আমার বিবিটা কেমন তরতরে আর তরতাজা!"

তাই বটে। ভাবে সুপ্রিয়। চাল-চলনে রতি-বিলাসিনী। কপালে কুন্তল বাতাসে এসে উড়ে উড়ে পড়ছে।

—"বাপ্! কি জবরদস্ত আওরাত রে বাবা! খপ্‌সুরত একটি মস্তানী!" গোঙায় ছোটেলাল। রক্ষিতার মদত যোগাতে যোগাতে অস্থির ছোটেলাল। ওকে শায়েস্তা করবার কিংবা যুঝ্‌বার হিম্মত নেই ছোটেলালের। মোকাবিলার কথায় সম্ভবত কেঁপে ওঠে ছোটেলাল।

—"বিবি। শোন্, শোন্!" কিন্তু কার কথা কে শোনে! বিবি ফুঁস্‌ছে, গর্জাচ্ছে, আছড়াচ্ছে, দাপড়াচ্ছে। আবেদন-নিবেদন অম্লান বদনে নাকচ করছে। সবকিছু বানচাল করে ছাড়বে। কিছুই বরদাস্ত করতে চাইছে না।—"দ্যাখ্, দ্যাখ্। আমার বিবিটাকে দ্যাখ্ বাবু একবার!" সুপ্রিয়কে উদ্দেশ্য করে বলে ছোটেলাল। ছোটেলালের ঘোলাটে চোখদুটোতে যেন হঠাৎ রঙ ধরেছে। তার আনমনা আর উদাসীন ভাবটা কেটে গেছে। কেমন একটা চাঙ্গা চাঙ্গা ভাব।

—"ঘোড়াটা যেমনি বদ্‌খত আর বিশ্রী, বিবিটা তেমনি জবরদস্ত খপ্‌সুরত। যখন আমাকে সোহাগ করে, তখন ঝড় বইয়ে ছাড়ে। মনে হয় সোহাগ নয়, খুন-খারাপি করে ছাড়বে। এমনি আদরের ঢঙ্!"

সুপ্রিয় ভাবে ছোটেলাল কি সরাব টেনেছে? আল্‌তু ফাল্‌তু বেমক্কা কথাবার্তা চালাচ্ছে!

—"আমাকে পয়সা দিয়ে গেলি না ক্যেন?" বলে মেয়েটা।

—"তোর পয়সার অভাব কি রে? তোর যেরকম চন্‌মনে উড়ু উড়ু ভাব। ছেলে-ছোকরারা জান্ লড়ে দিতে প্রস্তুত। দিল্ হাজার টুক্‌রো করে তুই টুক্‌রো টুকরো বিলোচ্ছিস্ অনবরত। আর আমার কথা ভাব দেখি! খেসারত দিতে দিতে গলদঘর্ম।"

—"বেতমিজ! বেয়াকুব!" বলে মেয়েটা।

—"হা হা!" হাসে ছোটেলাল।

—"বিবি কথায় কথায় মোহাব্বত ছড়ায়। তবে মরজিটা একটু বেশি।"

সুপ্রিয় বুঝতে পারে মেয়েটা ওর ভরা যৌবনের ঢলে অনেক তাগড়া জোয়ান ছোকরাকে নাকানি-চোবানি খাইয়েছে। ঢলাঢলি করেছে প্রচুর।

—"ঘরে মেহমান্ এলো। দানাপানি দেবার মুরোদ নেই। বেসরমের এক শেষ!" মেয়েটা ফোঁস্ ফোঁস্ করে। মেয়েটা বড্ডো মেজাজী। মোটেও মেনীমুখো নয়।

—"মেহমানের সঙ্গে যখন মুলাকাত হলোই তখন মেহমানের কাছে হাত পাততে দোষটা কিসের? মেহেরবান্ আদমী সব!"

—"যা যা। তোর সরম নেই। নির্লজ্জ কাহাকার! যৌবনকে লুট্‌তে জানিস্, ইজ্জতের গোড়ায় জল ঢেলে তাগড়া করতে পারিস্ না!"

—"বেয়াকুবটাকে মাপ করে দে। তা বাবু, সত্যি বলছি। বিবিটা আমার ভালো। আমার ঘোড়াটাকে আমি দানাপানি দিই। আওরাতটা আমাকে দানাপানি দেয়। নাচে। গায়। রঙ্গরস করে। ঠাট্টা ছড়ায়। আমার দিলটাকে চাঙ্গা করে। অন্য পাঁচ-জনার চোখে নেশা ধরায়।"

সুপ্রিয় তাকিয়ে দেখে মেয়েটা মজেছে। প্রতিক্রিয়ায় কেমন গলা গলা ভাব। রাগ জল হয়েছে। মৃদু মৃদু হাসছে। খোশ মেজাজে মধুর হাসি ছড়াচ্ছে। বুকে ওর উত্তুঙ্গ-পাহাড়ের স্পর্ধা। টুকটুকে গালদুটো আপেলের জৌলুস্ ছড়াচ্ছে। ঘন পল্লবে ঘেরা দুটি আঁখি। মুখে অনাবিল হাসি, সুঠাম দেহ-রেখায় উঁচু-নীচু ঢেউ। ত্বকে জৌলুস্ রয়েছে। বেশবিন্যাস সরল। সাদামাঠা। কিন্তু পোশাকের ভাঁজে ভাঁজে যৌবনের হাতছানি। নিতম্বের নিচে শাড়ি। নিতম্বের পেশীগুলো চলার ফাঁকে ফাঁকে যেন আলাপনে মত্ত। রুক্ষ, তৈলবিহীন, এলোমেলো চুলগুলো বাতাসে উড়ছে। অঙ্গে পাঁইজোর, তাই পাঁয়তারাটা একটু বেশি। মেহেদী মেখেছে হাতে-পায়ে।

—"তুই তিন-চার দিন ডুব মারিস্। গাঁয়েব হয়ে যাস্। কি করে চলে আমার ভেবে দেখেছিস্ কখনো ?"

—"মেহমানের সংখ্যা বাড়িয়ে যাবি। সুরাহা হবে।"

হা-হা করে হাসে ছোটেলাল। এতোক্ষণে সে সব দুঃখ-কষ্ট ভুলেছে।

—"আমার চুড়ী এনেছিস্ ?"

—"না।"

—"ছোটেলাল নিশ্চয়ই কাজে-কর্মে বড্ডো ব্যস্ত ছিলো। তাছাড়া শুনেছি সারাটা দিন সওয়ারী মেলেনি ওর।" বলে সুপ্রিয়।

—"যাও যাও বাপু। শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল। ওকে তোমার চেয়ে আমি বেশি চিনি। খালি খালি মিথ্যার বেসাতি !" ফোঁস্ ফোঁস্ করে ওঠে মেয়েটা।

—"আমার কাঁচুলী এনেছিস্ ?"

—"না। পয়সা কোথায় ? আর জানিস্ তো আকাশ-ছোঁয়া সব জিনিসের দাম। ফাল্‌তু বাজারে পয়সা ঢালতে আমি রাজী নই।" ছোটেলালের সাহসটা যেন বেড়েছে।

—"ঠিক আছে। এসব ফাল্‌তু হলো ! ঠিক আছে, মিথ্যার বেসাতি আর সাজাতে দেবো না। জবানের যার ঠিক নেই সে আবার মরদ নাকি ! খালি মামুলী কথা।" থু করে থুথু ছিটোয় মেয়েটা।

—"আর আসিস্ আমার ঘরে !" মেয়েটা বলে।

—"জোর করে ঢুকবো।" বলে ছোটেলাল।

—"ইস্, মগের মুলুক পেয়েছে ! দেখবো কতো হিম্মত !" মেয়েটা ঢং-ঢাং দেখিয়ে চলে যায়। ছোটেলাল হেসে গড়িয়ে পড়ে।

সুপ্রিয় বেশ বুঝতে পারে যে, ছোটেলাল উৎকট লালসায় পঙ্গু রোগী। হিম্মত নেই। দুরাশা রয়েছে। এর আগেই সে সুপ্রিয়র কাছে মেয়েটার ভূয়সী প্রশংসা করেছে। এবার সুপ্রিয় মেয়েটাকে দেখলো। মেয়েটার নাম নন্দা।

॥ গ ॥

রেস্ট হাউসের বারোনম্বর ঘরে বসে সুপ্রিয় ভাবছিলো মিনতিদির কথা। এরকমভাবে মিনতিদিকে বিদায় দিতে হবে ভাবেনি সুপ্রিয়। সাক্ষাৎটা নেহাৎই করুণ আর অপ্রত্যাশিত। শেষ যেবার সুপ্রিয় মিনতিদিকে দেখেছিলো সে অনেক বছর আগেকার ঘটনা। ফেলে-আসা দিনগুলো হাতড়িয়ে বেড়ায় সুপ্রিয়। মনের স্মৃতি-কোঠায় উঁকিঝুঁকি দেয়।

কলকাতায় বড় হোটেলটার পাশে সুপ্রিয় ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে অপেক্ষা করছিলো। সে সময়ে সুপ্রিয় ট্যাক্সি চালাতো। বড়দিনের উৎসব। সারাটা চৌরঙ্গী অঞ্চল আলোয় আলোকময়। কল-কোলাহলের অন্ত নেই। লোকজনের প্রচণ্ড ভীড়। যানবাহনের স্রোত অবিশ্রান্ত গতিতে বয়ে চলেছে। দোকানগুলো আলোয় ঝলমল করছে। সবকিছু সাজিয়েছে চমৎকারভাবে। নিওনের ছটায় সারাটা অঞ্চলকে ইন্দ্রপুরী বলেই মাঝে মাঝে ভুল হয়।

ল্যাম্পপোস্ট, বাড়ির কার্ণিশ, দোকানের জানালা থেকে বেলুন উড়ছে। প্রাণ-বন্যায় ভেসে যাওয়া লোকগুলো খুশির হাওয়া উড়িয়ে চলেছে। রেঁস্তোরা আর হোটেলগুলোতে মদের ফোয়ারা ঝরছে। বিভিন্ন তালে ব্যাণ্ড বাজছে। অর্কেস্ট্রায় রম্ভা আর সম্ভা। জাজ আর ফক্সট্রট্। ট্যুইস্ট্, রক্ এ্যাণ্ড রোল। ক্লান্তিবিহীনভাবে ছেলে-মেয়েগুলো নেচে চলেছে। উর্দিপরা বেয়ারা-খানসামার দল ছোটাছুটি করছে। রোস্ট আর কাবাবের গন্ধে বাতাস ভারী। কয়েকজন বিদেশী নাবিক এইমাত্র একটি শ্বেতাঙ্গিনী রমণীকে কাঁধে ফেলে হৈ-হুল্লোড় করে চলে গেলো। মেয়েটা হাত-পা ছুঁড়ছিলো।

সুপ্রিয় হোটেলের দোতলায় ওঠবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলো। সিঁড়ির গোড়ায় একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠতেই সুপ্রিয় সেদিকে তাকিয়ে দেখে। গোলমালের জন্যে দায়ী এক ভদ্রমহিলা

অত্যধিক মদ্যপানের জন্যে ভদ্রমহিলা টলছিলো। তার বেশবাস ছিলো অসংযত। ভদ্রমহিলা সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় ওঠবার চেষ্টা করছিলো। উঠতে পারছিলো না। হোটেলের কর্তৃপক্ষ কিছুতেই তাকে ওপরে উঠতে দেবে না। ভদ্রমহিলা নিজে ওঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে বার বার পড়ে যাচ্ছিলো। ভদ্রমহিলা তারস্বরে চীৎকার করছিলো। বাংলা আর ইংরেজী বকুনি ছিটোচ্ছিলো আর প্রচুর ভুল বক্‌ছিলো। তার এক কথার সঙ্গে অন্য কথার কোনো যোগ ছিলো না। হোটেলের কর্তৃপক্ষ আপ্রাণ চেষ্টা করছিলো ভদ্রমহিলাকে ওখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। কিন্তু পারছিলো না। সুপ্রিয় এগিয়ে যায়। আর এগিয়ে গিয়েই চম্‌কে ওঠে। হাত দিয়ে বার বার সে চোখ রগড়ায়। না। এ কি করে সম্ভব? ঠিক রাজগীরের দিনটির মতো সেদিনও সে বিভ্রান্ত হয়েছিলো। না, তার ভুল হয়নি। কখনো ভুল হয়নি। এ সেই মিনতিদি।

ভদ্রমহিলার পরনের শাড়িটার খানিকটা ছিঁড়ে গেছে। জুতোর ঘর্ষণেই সম্ভবত ছিঁড়েছে। শাড়ির এক অংশ মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলো। মাটিতে বসে পড়ে মিনতিদি ক্রমাগত হাত-পা ছুঁড়ছিলো। নেশায় বুঁদ্। ছোট করে ছাটা চুলগুলো তেল-জলের অভাবে রুক্ষ। হাওয়ায় উড়ছিলো। ঠোঁটে লাগানো পুরু লিপস্টিক্। চোখদুটো মদের নেশায় আরক্ত। অর্ধেক বোজা। দৈহিক আর মানসিক ক্লান্তির ছায়া চোখের চারদিকে লেপ্‌টে রয়েছে। হাত-পা ছুঁড়ে মিনতিদি সবকিছুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছিলো। একপাটি জুতো মেঝেতে খুলে পড়েছে। কেউ তাকে ধরতে গেলে তাকে আঁচড়িয়ে কামড়িয়ে নাস্তানাবুদ্ করে ছাড়ছিলো মিনতিদি। ভালো করে সুপ্রিয় তাকিয়ে দেখে। না, কোথাও ভুল নেই। মিনতিদিকে সুপ্রিয় একসময় ভালো করেই চিনতো। বারান্দায় ইতিমধ্যে বেশ কিছু লোক জড়ো হয়েছে। এ প্রমোদ-ভবনে আজ রাত্তিরে অনেকের সঙ্গে প্রণয়-অভিনয়-এর বাসনা নিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে মিনতিদি উপস্থিত হয়েছিলো।

কর্তৃপক্ষ তাকে কিছুতেই ভেতরে ঢুকতে দেবে না। সুপ্রিয় ওদের কাছে শুনলো এর আগে বার-কয়েক টাকাকড়ি না দিয়ে নাকি মিনতিদি সরে পড়েছিলো। এবার দরকার হলে হোটেল কর্তৃপক্ষ পুলিশ ডাকবে। সুপ্রিয়র কোনো দিকে হুঁশ ছিলো না। বহুবছর পরে সে মিনতিদিকে দেখলো। সে দেখছিলো আর দেখছিলো। সেই নাক। সেই চোখ। সেই গালের আঁচিলটা। কাজল, লিপস্টিক্, পাউডার, স্নো, ক্রীম, সব ক'টির সাহায্য নিয়ে মিনতিদি বয়সের সঙ্গে তুমুল লড়াইতে মেতেছিলো। কিন্তু বয়সটা টুক্ করে কোন্ ফাঁকে বেরিয়ে এসে সদম্ভে নিজের বিজয়বার্তা ঘোষণা করে বসেছে। মিনতিদি বয়সকে ফাঁকি দিতে পারেনি। পারেনি গাল, গলা, মুখের রেখা আর ভাঁজগুলোকে ঢেকে-ঢুকে রাখতে। সিল্কের শাড়িটা মাঝে মাঝে গা থেকে খুলে পড়ছিলো। ব্লাউজের কাট্ রুচি-সীমানার অনেক নীচে। চোখের নীচের কালিমা অনেক-গুলো লজ্জা-পাওয়া মসীলিপ্ত রাত্রির সাক্ষী বহন করছিলো।

সুপ্রিয়র সব কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছিলো। পালিয়ে যাবে নাকি সে ওখান থেকে? যদি মিনতিদি তাকে চিনে ফেলে! না, তা বোধ করি সম্ভব নয়। মিনতিদি সুস্থ নয়। সেই লক্ষ্মী-প্রতিমার মতো দেখতে মিনতিদির আজ এ কি অবস্থা! ঘরের প্রতিমা ঘর থেকে নির্বাসিতা হয়ে হোটেলের মেঝেতে গড়াচ্ছিলো। বুকটা দুঃখে ফেটে যাচ্ছিলো সুপ্রিয়র। দু'জন ভদ্রলোক নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় মত্ত। তাদের টুক্‌রো টুক্‌রো কথা সুপ্রিয়র কানে ভেসে আসছিলো। --"সী ড্রিঙ্কস্ লাইক এ ফিস্।"—"তুই ওকে চিনিস্ নাকি?"—"চিনি নে আবার! ওর জন্যে হোটেলের অনেক মোটা টাকার বিল আমাকে মেটাতে হয়েছে।" সহস্র বৃশ্চিক-দংশন-জ্বালার চেয়েও এ জ্বালা তীব্রতর। সুপ্রিয় চঞ্চল হয়। লোকগুলোর হাসি কিরকম যেন বিশ্রী আর কুৎসিত। সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে আর মদের গন্ধ ছড়িয়ে ওরা সুপ্রিয়র পাশ দিয়ে চলে গেলো। অনেকদিন আগেকার মিনতিদির চেহারাখানা সুপ্রিয়র চোখে

সেদিন ভেসে উঠেছিলো। মাথার একরাশ কোকড়ানো চুল খুলে দিয়ে রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে মিনতিদি দাঁড়িয়ে থাকতো। মিঠে রোদ্দুরের সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি মুখখানি। এতো ভালো লাগতো সুপ্রিয়র!

হোটেলের মেঝে থেকে কোনো এক সময় মিনতিদি উঠে দাঁড়িয়েছিলো। টলছিলো মিনতিদি। সুপ্রিয় সেদিন সে মুহূর্তে ভেবে ভেবে কোনো কূল-কিনারার সন্ধান পায়নি' সাধনদা মিনতিদিকে কি ভালোটাই না বাসতো! মিনতিদি বলতে সাধনদা ছিলো অজ্ঞান। মিনতিদির শরীর একটু খারাপ হলে সাধনদা কি দৌড়-ঝাঁপই না করতো! সাধনদা আসামের শিলং এ একটা রেঁস্তোরার মালিক ছিলো। ছোট্ট রেঁস্তোরার জানালার জন্যে হয়তো যেদিন পরদার কাপড় যোগাড় করা সম্ভব হচ্ছিলো না, পয়সার অভাবে পরদার কাপড় কেনা যাচ্ছিলো না, মিনতিদি ফস্ করে তার দু'খানা ভালো শাড়ি ছিঁড়ে সেদিন পরদার জন্যে কাপড় জুগিয়েছিলো। দোকানটাকে যে করে হোক বাঁচাতে হবে। গড়ে-পিঠে দাঁড় করাতে হবে। সুপ্রিয় শুনেছিলো সাধনদা নাকি শেষপর্যন্ত ঘুমের ওষুধ গিলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলো। একটু বেশি বয়সে ঘর বাঁধতে গিয়ে সাধনদা হোঁচট খেয়ে গড়িয়ে পড়লো। মিনতিদি আর সাধনদার বয়সের ব্যবধান ছিলো বেশ অনেকটা।

এদিকে চৌরঙ্গীর হোটেলে ব্যাণ্ড বাজছিলো। চারদিকে আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছিলো। শুধু আলোর রোশনাই। কিন্তু সুপ্রিয়র মনে ব্যথার বোঝাটা ছিলো বড্ডো ভারী। সুপ্রিয় হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে শিলং-এ সাধনদার সেই ভাঙা রেঁস্তোরার চায়ের কাপ-ডিস্‌গুলোর টুং-টাং শব্দ যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলো। ব্যাণ্ডের শব্দ, হাসি, ঠাট্টা, গান, মনুষ্য-গুঞ্জন সব কিছু ছাপিয়ে ওই শব্দগুলো যেন বড্ডো স্পষ্ট। আর তার সঙ্গে মিনতিদির সেদিনকার সেই হাসি সবকিছু ছাপিয়ে জেগে উঠেছিলো। স্মৃতির দোলায় দোল খাচ্ছিল সুপ্রিয়। এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে মিনতিদিকে মেঝে থেকে টেনে উঠিয়ে একরকম টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিলো

সুপ্রিয়র ট্যাক্সি পর্যন্ত। ভদ্রলোক অবাঙালী। সুপ্রিয় ততোক্ষণে ট্যাক্সির পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলো।

—"শেয়ালদা স্টেশনে যেতে পারবেন ?"

পরিষ্কার বাংলায় ভদ্রলোক সুপ্রিয়কে জিজ্ঞেস করেছিলো। সুপ্রিয় রাজী হতেই ভদ্রলোক মিনতিদিকে একরকম জোর করেই ট্যাক্সির ভেতর বসিয়ে দিয়েছিলো। মিনতিদির শাড়ির আঁচল কাঁধ থেকে খসে মাটিতে লুটোচ্ছিলো। ব্লাউজের গোটা-দুই বোতাম খোলা। বর্তুলাকার এবং বৃহদাকার মাংসপিণ্ড দুটো ক্ষণে ক্ষণে উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছিলো। অবাধ্য হচ্ছিলো বার বার। ভদ্রলোক মিনতিদিকে ট্যাক্সির ভেতর একরকম জোর করে ঢুকিয়ে দিয়ে সম্মিলিত উৎসুক জনতার কৌতূহলী দৃষ্টির ওপর ঝপাৎ করে একটা কালো পরদা টেনে দিয়ে নিজেও একফাঁকে টুক্ করে ট্যাক্সির ভেতর ঢুকে পড়েছিলো। ক্ষুধার্ত নেকড়েগুলো জিভ চাট্‌ছিলো ঘন ঘন। মিনতিদির তীব্র চীৎকার— "আমি যাবো না। কক্ষণো যাবো না। তোমার ঘর থেকে এ জায়গা অনেক ভালো। ফুঃ! তোমার ঘরে আছে কি ? এরকম রোশ্‌নাই আছে ? দিল্ দেওয়া-নেওয়ার বাহার আছে ?"

সুপ্রিয়র সমস্ত দেহটা যেন অবশ হয়ে গিয়েছিলো। তার মগজটা চিন্তার হাত থেকে রেহাই পেতে চেয়েছিলো। সে যেন বড্ডো ক্লান্ত। বড্ডো দুর্বল। সামনের সবকিছু যেন ঝাপ্‌সা ঠেক্‌ছিলো।

শেয়ালদা স্টেশনের দিকে ট্যাক্সি ছুটে চলেছিলো। পেছনের সীটে ভদ্রলোক আর মিনতিদি বসেছিলো। ট্যাক্সি চালাচ্ছিলো সুপ্রিয়।

—"আমার বড্ডো শীত করছে গো! লক্ষ্মীটি, তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরে বসো না গো।" মিনতিদি নিজেই ভদ্রলোককে জড়িয়ে ধরতে চেয়েছিলো।—"এ কি হচ্ছে!" ভদ্রলোক শাসিয়েছিলো। —"আমার বড্ডো ঘুম পাচ্ছে!"—"তুমি ঘুমোও।" বলেছিলো ভদ্রলোক। শীতের কুয়াশায় ট্যাক্সির সামনের কাঁচটা ঘন ঘন

ঝাপ্‌সা হচ্ছিলো। সুপ্রিয়র চোখদুটো বার বার জলে ভরে উঠেছিলো।—"চোখ দুটো এরকম জ্বলছে কেন? চোখে কিছু পড়লো নাকি?" ভাবলে সুপ্রিয়।

ট্যাক্সি চালাতে চালাতে সুপ্রিয়র হাতটা খুব ঘন ঘন কাঁপছিলো। সাধনদার কথা তার খুব বেশি করে মনে পড়ছিলো। সাধনদা প্রথমবার সংসার পেতেছিলো। সংসার টেঁকেনি। বউ পালিয়েছিলো। এ ছিলো তার দ্বিতীয় চেষ্টা। এবার সাধনদা পৃথিবী ছেড়ে নিজেই পালালো। মন্ত্র পড়ে, পুরোহিত ডেকে সাধনদা মিনতিদিকে বিয়ে করেনি।

মিনতিদি কি সুপ্রিয়কে চিনেছে?

অবশ্যি তাকে চেনবার মতো অবস্থায় মিনতিদির ছিলো না। মদে চুর। সুপ্রিয় ভাবে, তার সঙ্গে সাধনদা আর মিনতিদির আলাপের পর অনেক গুলো বছর কেটে গিয়েছিলো। ততোদিনে গঙ্গা-যমুনা দিয়ে বয়ে গেছে অনেক জল।

ট্যাক্সি ট্রাফিক্ টাওয়ারের রক্তচক্ষু দেখে গতি বন্ধ করেছিলো। একটি ভিখিরী এসে মিনতিদির কাছে হাত পাতলো। মিনতিদি ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে কতোগুলো খুচরো পয়সা বের করে ওর হাতে গুঁজে দিয়েছিলো।

—"রাজরাণী হও মা।" ভিখিরীটা যাবার আগে হাত তুলে আশীর্বাদ করে গেলো। হা-হা করে হেসে মিনতিদি গড়িয়ে পড়লো। মাতাল অবস্থা। ট্যাক্সি আবার ছুটে চললো।

—"তোমার নাম কি গো বাপু?"

মিনতিদি সুপ্রিয়কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলো।

—"এই! এসব কি হচ্ছে? তুমি চুপ করো দিকিন্!" ভদ্রলোক মিনতিদিকে থামাবার চেষ্টা করে। সুপ্রিয় ওর কথার জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি।

—"নাম জিজ্ঞেস করতে নেই বুঝি? বেশ, জিজ্ঞাসা করবো না।" বলেছিলো মিনতিদি। গাড়ির ভেতর ছিলো উগ্র মদের গন্ধ।

স্টিয়ারিং-হুইলের ওপর রাখা সুপ্রিয়র হাতটা থর থর করে কাঁপছিলো।

—"আমাকে কয়েকটা ফুলের মালা কিনে দেবে?" মিনতিদির কণ্ঠে আবদারের সুর। গাড়ি লোয়ার সার্কুলার রোড ধরে এগোচ্ছিলো। ফুলের দোকানে ফুলের সমারোহ।

—"ফুলের মালা ওই সামনের দোকানটা থেকে কিনে নিয়ে এসো।" ভদ্রলোককে মিনতিদি অনুরোধ করে। আর সে অনুরোধ ভদ্রলোক ঠেলতে পারেনি। ট্যাক্সির গতি রুদ্ধ হয়। ভদ্রলোক মালা কিনতে নেমে গিয়েছিলো। সুপ্রিয় স্টিয়ারিং-হুইলে হাত রেখে বসে ছিলো। পেছনে মিনতিদি। পথে ছিলো যানবাহনের ভীড়।

—"কি গো? তুমি যে একটি কথাও বলছো না?" মিনতিদির কণ্ঠস্বর হঠাৎ কেমন যেন অন্যপথে মোড় নিয়েছিলো।

—"ভেবেছো আমি তোমাকে চিনতে পারিনি? খুব পেরেছি! আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া সোজা নয়। এতোক্ষণ তোমাকে না চেনবার ভান্ করছিলাম।" মিনতিদি বলেছিলো। চমকে উঠেছিলো সুপ্রিয়। পেছন ফিরে তাকালো সে। তার মুখে কথা নেই। সে আত্মবিস্মৃত, বিমূঢ়। এতোটা সে আশা করেনি।

—"অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। তবু দেখামাত্রই চিনেছি। হ্যাঁ, ঠিক চিনেছি। আমাকে দেখে খুব ঘৃণা হচ্ছে? আমি মাতাল, অসতী! কি, চুপ করে রইলে কেন? জবাব দাও! বলো একটা কিছু! আমার সঙ্গে কথা বলতে ঘৃণা হচ্ছে? মনে নেই আমাকে?"

—"না।" একটি ছোট্ট কথা বেরিয়েছিলো সুপ্রিয়র মুখ থেকে। ওই একটি কথার ছিলো অসম্ভব শক্তি। সাইক্লোনের মতোই ছিলো ওর প্রচণ্ড গতি। ভেঙে-চুড়ে সব চূরমার করে দিতে চেয়েছিলো। সুপ্রিয়র মাথাটা কেমন যেন ঘুরছিলো। পৃথিবীটা সে মুহূর্তে গুঁড়িয়ে গেলে কি ক্ষতি ছিলো! সেইরকমই ভেবেছিলো সুপ্রিয়।

—"আমি কাউকে চিনিনে। কোনোদিন চিনতামও না।" একরকম চেঁচিয়ে বলেছিলো সুপ্রিয়।

—"মিথ্যেবাদী! তুমি ভয় পেয়েছো। না। না। তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ আমি চাইছি নে। বিশ্বাস করো তুমি, আমি তোমার সঙ্গে নূতন সম্বন্ধ পাতবার জন্যে আর কোনোদিন এগিয়ে যাবো না। আমি তোমাকে ভুলে গেছি। বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে সম্পূর্ণ ভুলে গেছি। হ্যাঁ, ভুলে গেছি। শুধু একটিবার তুমি আমাকে বলো—তুমি আমাকে চেনো! শুধু একটিবার!" মিনতিদির সেদিন সে কি করুণ মিনতি!

—"আমি আপনাকে চিনিনে। কখনো চিনতাম না।" সুপ্রিয়র দৃঢ় কণ্ঠস্বর।

—"এখনো তুমি ছেলেমানুষটি রয়েছো!" হা হা করে হেসে উঠেছিলো মিনতিদি। একটু দূরে হাতে মালা নিয়ে ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়েছিলো। ভদ্রলোক ট্যাক্সিতে উঠতেই সুপ্রিয় ট্যাক্সিতে স্টার্ট্ দিয়েছিলো। গন্তব্যস্থল শেয়ালদা স্টেশন। মদের গন্ধে গাড়ির ভেতরকার আবহাওয়া বিষাক্ত হয়ে উঠেছিলো। দুটি হৃদয়ে সেদিন সে কি অসহ্য যাতনা!

রাজগীরের রেস্ট হাউসের বারো নম্বর ঘরে বসে সুপ্রিয় স্মৃতি রোমন্থন করছিলো। না, আর ভাবতে ভালো লাগছিলো না। এ ভাবনায় সুখ নেই। বড্ডো ক্লান্তি এনে দেয়। মনটাকে পঙ্গু আর অবশ করে তোলে। মিনতিদি সম্বন্ধে আর ভাবতে ভালো লাগছিলো না সুপ্রিয়র।

॥ ঘ ॥

রাজগীরে কুণ্ডের চাতালে ছোটেলাল একরাশ জুতো আগলাচ্ছে। একটু দূরে কুণ্ডের সিঁড়ি নেমে গেছে। পাথর দালানে একরাশ লোকের ভীড়। দেয়াল থেকে গরম জল পড়ছে। সেখানে অনেক পুরুষের সঙ্গে বসে মেয়েটা, মানে সেই নন্দা স্নান করছে। চাতালে দাঁড়িয়ে সুপ্রিয় নজর হান্‌ছে এদিক-ওদিক।

মেয়েটা যেন অশালীন আচরণে মেতে উঠেছে। শুধুমাত্র পাতলা একটা শাড়ি তার পরনে। জলে ভিজেছে সে শাড়ি। শাড়িটা মাঝে মাঝে পায়ের পাতা থেকে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত টেনে তুলছে মেয়েটা। উরু পর্যন্ত উঠিয়ে মাজা-ঘষা করছে। স্নানরত পুণ্য-লোভী অনেকেরই সেদিকে লুব্ধ দৃষ্টি। গন্‌গনে এক মাল্‌সা আগুনের ওপর যেন জল ছিটোচ্ছে মেয়েটা। যৌবনের আগুন জ্বল্‌ছে। নন্দার কেমন যেন ঘুম-ঘুম চোখ। অভাব-অনটনের টানা-পোড়েনে পোড়-খাওয়া পঁচিশের শরীরটা। তবুও যৌবন সম্পদ অটুট, অঢেল। পুরুষের ভীড় ধীরে ধীরে বাড়ছে। উপলক্ষ স্নান—না নন্দা ? দৃষ্টি দিয়ে লেহন, না স্নান করে পুণ্য সঞ্চয় ? হয়তো দুটোই।

বাইরে চাতালে জুতো জম্‌ছে আর জম্‌ছে। এক জোড়া জুতো আগলাবার মেহনতের জন্যে মজুরি দশ নয়া পয়সা। ছোটেলালের আয় একটু একটু করে বাড়ছে। মেয়েটার দেহে পাতলা শাড়িটা জলে ভিজে একসা। নন্দা অনাবৃত জানু মাজছে, ঘস্‌ছে, ডল্‌ছে, মল্‌ছে। নগ্ন উরুতে উল্কী-আঁকা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সুপ্রিয়। তেল-চক্‌চকে জঙ্ঘা। বাইরে টম্‌টম্‌ওয়ালার সঙ্গে দরদস্তুর না করেই ওদের হাতে একরাশ টাকা-পয়সা গুঁজে ছুট্ লাগিয়েছে মার্চেন্ট অফিসের সেজবাবু। রেল কোম্পানীর গ্রেড ওয়ান ক্লার্ক। ওরা সবাই ছুটছে কুণ্ডের জলের দিকে। বাতের ব্যথা রাতারাতি বড্ডো বেড়েছে। কুণ্ডের উষ্ণ জলে ডুবোডুবি করছে পুরুষ আব নারী। জঙ্ঘার আকর্ষণ করেছে মোহের সৃষ্টি। জুতো জম্‌ছে। পয়সা পড়ছে হুড়হুড় করে।

ঐতিহাসিক যুগে মগধ রাজধানীর নাম হয় রাজগৃহ। শিশুনাগ বংশের রাজা বিম্বিসার এবং তার পুত্র অজাতশত্রুর রাজত্বকালে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে রাজগৃহ ভারতের শ্রেষ্ঠতম নগরীতে পরিণত হয়।

বৈভার পাহাড়ের পাদদেশে কুণ্ডগুলোর মধ্যে সপ্তধারা কুণ্ড ও ব্রহ্মকুণ্ড বিখ্যাত। বৈভার পাহাড়ের তলদেশ ও অন্য স্থানের গরম

জলের ঝরণাসমূহের ভেতর সপ্তধারা বৃহত্তম। যে সমস্ত ঋষির নামে এই ধারাগুলো বিখ্যাত তারা হলো—পরশুরাম, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, দুর্বাসা, বশিষ্ঠ ও পরাশর। এর পাশেই উত্তরদিকে ব্রহ্মকুণ্ড রয়েছে। এছাড়া রয়েছে গঙ্গা ও যমুনা। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করবার আগে সপ্তধারায় বস্ত্রাদি ভিজিয়ে নিতে হয়। গণেশকুণ্ড, সূর্যকুণ্ড, সীতাকুণ্ড, নানককুণ্ড ও মখতুম্‌কুণ্ড প্রভৃতি বিখ্যাত কুণ্ডগুলি বিপুল পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত। সুপ্রিয় শুনেছিলো কার্লোভিভেরীর উষ্ণ প্রস্রবণের কথা। চেকোশ্লোভাকিয়ার সম্রাট চতুর্থ চার্লসের শিকারের উদ্দেশে তৈরি ঘরে একবার চার্লসের কুকুর চিৎকার করতে করতে ছুটে এলো। দেখা গেলো কুকুরের শরীর ভেজা। জায়গায় জায়গায় ফোস্‌কা পড়েছে। উষ্ণ প্রস্রবণে ছিলো খনিজ পদার্থ এবং তেজস্ক্রিয় গ্যাস। ভারতবর্ষে প্রায় তিনশো প্রস্রবণ রয়েছে। বিহারের রাজগীরের প্রস্রবণ, দেরাদুনের সহস্রধারা, বাংলার বক্রেশ্বর প্রস্রবণ বিশেষভাবে খ্যাত।

কুণ্ডের কাছেই মন্দিরের চাতালে-চত্বরে অন্ধ বিকলাঙ্গ ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটেছে। জড়বুদ্ধি ও অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়।

মৃত্যুর করাল কালোছায়া ঘাড়ে তুলে লোকগুলো ধুঁক্‌ছে, ভুগ্‌ছে। শিশু ভুগ্‌ছে অম্লপিত্তজনিত রোগে। অস্থিচর্মসার। এরই ভেতর পথ করে পায়ে পায়ে এগুচ্ছে পুণ্য-লোভাকৃষ্ট যাত্রীর দল। ধর্ম লুটবে। মজা লুটবে। রোগমুক্ত হবে। ঘরে ফিরে গিয়ে দেশ-ভ্রমণের কাহিনী অফিসে-আদালতে বসে ফলাও করে বলবে। মনে হচ্ছে স্নানার্থীর দল রূপসুধা পান করে মাতাল হয়েছে। পাঁচ মিনিটের স্নান সারতে দু'ঘণ্টা লাগ্‌ছে।

নন্দা যেন ভীড়টাকে উস্‌কানি দিচ্ছে। মেয়েটা যতোই বে-আব্‌রু হচ্ছে, ভীড়ের যেন ততোই ছট্‌ফটানি বাড়ছে। ছোটেলাল জুতো আগলাতে আগলাতে হাঁপিয়ে উঠেছে। ছোটেলাল পয়সার অভাবে বড্ডো কষ্ট পাচ্ছিলো। মেয়েটা কথা রেখেছে। জবানের খেলাপ

করেনি। ছোটেলাল সুযোগ বুঝে পয়সা কুড়োচ্ছে। পঁচিশের আগুনে দাউ-দাউ করে জ্বলছে দেহটা। দেহের দাপট্ ছড়াচ্ছে মেয়েটা। থেকে থেকে পুরুষগুলোর রক্ত ছলাৎ ছলাৎ করে ওঠে।

পানওয়ালী পান সাজিয়ে বসেছে। কতোরকমের পান। বিলারী, কাহের, কাপুরি, কাপুরকাণ্ড। নানারকমের জরদা। কালাপাত্তি, পিলাপাতি। পানওয়ালী একসময় এ অঞ্চলের কুখ্যাতা গণিকা ছিলো। এখনো দৃষ্টিতে তার আগুন ঝরে। এককোণে রামায়ণ-কথকের চারদিক ঘিরে উৎসুক জনতা গান শুন্‌ছে। ঝকঝকে রোদ্দুরের মিঠে আমেজ। চাতাল থেকে অনেকটা দূরে জাম গাছটার নীচে এক নবজাত পরিত্যক্ত শিশুকে একটা কুকুর পাহারা দিচ্ছে। কাক-শকুনের আক্রমণ থেকে ঠেকাচ্ছে। শিশুর চারদিকে কৌতূহলী জনতা ভীড় করেছিলো। ভীড় এখন অনেকটা পাতলা হয়েছে।

সুপ্রিয় শুন্‌লো কুকুরটা নন্দার। আজ সন্ধ্যায় নাকি কুণ্ডের আশেপাশে জোর ভীড় জমবে। ভারী পোগ্রাম রয়েছে। পাঁচালী, বাউলগান, কথকতা, নাচ, গান আর ঢপ্‌কীর্তনের ব্যবস্থা রয়েছে। কীর্তনের এক নূতন শাখা, তাকেই ঢপ্‌কীর্তন বলে। ঢপ্‌কীর্তন লীলাকীর্তনের মতো। কৃষ্ণলীলার পালা গান। ঢপ্ গায়ক-গায়িকা পাঁচালীর মতো বক্তৃতা দেয়। ছড়া বলে। যাত্রার মতো যৎসামান্য নাটকীয় সংলাপ ব্যবহার করে। ঢপ্‌কীর্তনওয়ালী কাল রাতে প্রচুর দর্শনী ও পেলা আদায় করেছে। ওর পায়ে ছিলো মল। গায়ে খেমটাওয়ালীদের মতো ওড়না। সর্বাঙ্গে অলঙ্কার, মস্তকে কবরীতে ফুল। চাতালের এককোণে বাউল বৈরাগী গাইছে রাধাকৃষ্ণ লীলা।

নন্দা কুণ্ডের জল থেকে উঠে আসে। জলসিক্ত দেহে ছুটে আসে সুপ্রিয়র কাছে। কতোটা দূর আর!

—"এই বাবু, আমার বে-আব্‌রু দেহটা দেখতে বুঝি খুব ভালো লাগ্‌ছে?"

—"এই, কি যা-তা সব বলছো।" লজ্জা পায় সুপ্রিয়।

—"বাবু শোনো। তুমি ওদিকটায় চলে যাও।" অঙুলি-নির্দেশ করে নন্দা গন্তব্যস্থল দেখিয়ে দেয়।

—"কেন যাবো ?"

—"আমার সরম লাগে।"

—"এতো লোকের সামনে বে-আব্রু হচ্ছো, তখন বুঝি লজ্জা করে না ?"

—"না, করে না। তুমি থাকলে করে।"

আরক্তিম বদনে চট্‌পট্‌ জবাব দেয় নন্দা। সুপ্রিয়র কান লাল হয়ে ওঠে। সে কি বলবে ভেবে পায় না। মেয়েটার তার সম্পর্কে এ ভাব কেন ? এ অকারণ লজ্জার অর্থ কি ?

—"জানো বাবু, আমি আরো বে-সরম আর বে-আব্রু হবো। আরো অনেকটা। বেইমানগুলো বসে থেকে হাঁ করে আমার বেইজ্জতি দেখবে।"

—কিন্তু কেন ? কেন তুমি এসব করতে যাও ? তোমার লজ্জা করে না ?" প্রশ্ন করে সুপ্রিয়।

হা হা করে নন্দা হেসে ওঠে।

—"জানো বাবু! ছোটেলালের দু'দিনের রুটির ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আরো দুটো লোকের রুটির ব্যবস্থা করতে হবে। এক রতনলাল। ওর বউটা ওকে ফেলে ভেগেছে অনেককাল। বুড়ো হয়েছে। চোখে কম দেখে। ওকে দেখবার কেউ নেই। ওর জন্যে পয়সার যোগাড় করতে হবে। আর রয়েছে চমনলাল। রেলে কুলীর কাজ করতো, মাল টান্‌তো। ট্রেনের চাকার নীচে পড়ে দুটো পা গেছে। ওকেও দেখতে হয়। ওর জন্যে রুটি যোগাড় করতে হয়।"

—"তার জন্যে তুমি বে-সরম হবে ?" বলে সুপ্রিয়।

—"উপায় নেই। তোমরা পুরুষজাতটাই এমনি। পয়সা চাইলে পয়সা ফেল্‌বে না কখনো। যৌবনটা নিয়ে টানা-হেঁচড়া করবার

সুযোগ দিলে তখন হুড়হুড় করে পয়সা ফেল্‌বে। হাজার চোখ আমার যৌবনকে চেটে-পুটে খায়। তখন ওদের পয়সা দিতে লজ্জা নেই। আমারও সরমের বালাই নেই। কিন্তু বাবু, তোমাকে দেখে আমার যে কি হলো! মনে হলো তোমার সঙ্গে আমার অনেক যুগ, অনেক কালের সম্বন্ধ। তুমি আমার অনেক কালের চেনা। আমি আর একটু মাজা-ঘষা করবো। তুমি বাচ্চাটার কাছে গিয়ে বোসো।"

—"ও বাচ্চাটা কার?"

—"কেন, আমার!" ঠোঁট টিপে টিপে হাসে নন্দা।

—"ঠাট্টা করছো?" বলে সুপ্রিয়।

—"কেন, আমার বাচ্চা হওয়া বারণ নাকি?"

—"ও তোমার বাচ্চা নয়, আমার মন বল্‌ছে।"

—"ভগবান আমার হাতে যখন তুলে দিয়েছেন, তখন আমারই বাচ্চা।" নন্দার মুখে-চোখে মাতৃত্বের উজ্জ্বল আভা।

—"ঠিক্‌ঠাক্ করে সবকিছু বলো দিকিন্!"

—"বুঝ্‌তেই তো পারছো সবকিছু। বড়ো ঘরের বড়ো ব্যাপার। ওদের সখ-আহ্লাদ যখন সরমের বাত হয়েছে, তখুনি আমার হাতে তুলে দিয়েছে। আমার বাচ্চা বলে চালাতে হবে। রূপিয়া মিলেছে। রতনলাল আর চমনলালের জন্যে রূপিয়ার দরকার। চারটে বাচ্চা পর পর এসেছে। অনেকদিন পুষেছি। নিজের বলে চালিয়েছি। পরে অন্যের হাতে তুলে দিয়েছি। অন্যের বউ-বেটীদের খালাস করে আমি সবকিছুতে জড়িয়ে পড়ি।"

নন্দার মুখখানাতে যেন স্বর্গের আভা ফুটে উঠেছে। সুপ্রিয় ভাবে কুণ্ডের জল বুঝি এদের স্পর্শে অপবিত্র না হয়ে আরো অনেক বেশি পবিত্র হয়ে উঠ্‌ছে।

—"বাচ্চাটাকে নিয়ে এখন কি করবে?"

—"আগের চারটে বাচ্চার যা করেছি এবারও তাই করবো। বাচ্চার জন্যে অনেকে হা-পিত্যেস্ করে বসে আছে। একটা বাবু

আছে। নাম বল্‌বো না। তার বউটা যেন লক্ষ্মী-প্রতিমা। মা ঠাক্‌রুনের মুখের দিকে চাইলে বুকটা ফেটে যায়। ওর বাচ্চা হতে হতেও হয় না। পেটের ভেতর নষ্ট হয়ে যায়। বাবুটা ঠাক্‌রুনের ভেতর কি একটা বদ্‌খত রোগ ঢুকিয়ে দিয়েছে। পুরুষজাতটা বড্ডো বদমাস্‌। ওই মা ঠাকরুনের হাতে বাচ্চাটা তুলে দেবো।"

মেয়েটা খিল খিল করে হেসে ওঠে।--"তুমি বাচ্চাটার কাছে গিয়ে বোসো। বাচ্চাটা পাহারা দিচ্ছে আমার কুকুরটা। তোমার কোনো ভয় নেই।"

ছুটে পালায় নন্দা। সুপ্রিয় হা করে তাকিয়ে থাকে। রত্নগিরি শীর্ষে জাপানী বুদ্ধ-সংঘ কর্তৃক স্থাপিত বিশ্বশান্তি স্তূপ থেকে ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আস্‌ছে। কুণ্ডের কাছেই বেনুবন। ওখানে বুদ্ধদেব এক সময় অনেক ঘুরে বেড়িয়েছেন। আজ ওখানে তাঁর পুণ্যতিথি উপলক্ষে অনেক কিছুর আয়োজন করা হয়েছে। বুদ্ধদেব ছিলেন বিশ্বপ্রেমিক। মানবপ্রেমিক।

নন্দা দেহ-মন ঢেলেছে মানব-কল্যাণে। মানবপ্রেমের মহান ব্রত সে গ্রহণ করেছে।

কাছাকাছি একটা পোড়ো ঘরের ছাদে দুটো কাক বসে কর্কশস্বরে ডাক্‌ছে। কুৎসিত আর অশুভের ইঙ্গিত। আর ওদিকে তরতর করে বয়ে-যাওয়া জলস্রোতের ওপর সাঁতার কাট্‌ছে হাঁসের পাল। শ্বেত শুভ্র, মহান সুন্দর। সাঁতার কাট্‌ছে গরীয়সী মহীয়সীর ভঙ্গীতে। ওরা সাঁতার কেটে এগিয়ে যাচ্ছে। কুণ্ডের জল থেকে মাথা উঁচু করে সত্তর বছরের বুড়োটা লুব্ধ দৃষ্টি ফেল্‌ছে আশেপাশে। নন্দার খোঁজ করছে সম্ভবত।

॥ ৬ ॥

কুণ্ডের পাশে গাছটার নীচে দাঁড়িয়ে সুপ্রিয় মিনতিদির কথা ভাবছিলো। সুপ্রিয় ভাবছিলো আর ভাবছিলো। শিলং সহরে সুপ্রিয়র সঙ্গে মিনতিদির আলাপ হয়েছিলো। শিলং নামটি ভারী সুন্দর। নরম, মিষ্টি, মনোরম আর মোলায়েম। বার বার নামটি উচ্চারণ করতে ইচ্ছে হয়। কৈশোরে প্রেমে পড়েছে যে ছেলে, তার প্রেমিকার নামটি তার কাছে যেমন মিষ্টি মধুর, এও ঠিক সেরকম। এই তো কিছুদিন আগে সুপ্রিয় শিলং ঘুরে এলো। মোটর স্টেশনটার কতোই না পরিবর্তন হয়েছে। চেনাই যায় না শিলংকে। চারদিক বাড়িতে বাড়িতে ছেয়ে গেছে। লোকে লোকারণ্য। কতো স্মৃতি-জড়ানো ওই শিলং শহর। আজকের শিলং-এর সঙ্গে সেদিনকার শিলং-এর কতো প্রভেদ! ভারী ভালো লাগে সুপ্রিয়র শিলং-এর কথা ভাবতে। ইচ্ছে করে কল্পনার রঙীন জাল বুনতে। পাহাড়ের চূড়োয় চূড়োয় মেঘের আনাগোনা। পাইনবীথির ভেতর সেই সর্পিল পথ। কুয়াশা-ঢাকা পাহাড়ের চূড়োয় অজানা উপলখণ্ডের ওপর বসে নিজের নাম লেখার সেই অপূর্ব শিহরণ আর উত্তেজনা।

পুলিশবাজার থেকে লাবান পাহাড় স্পষ্ট দেখা যায়। সারা লাবান পাহাড়-ভর্তি বাড়ি আর বাড়ি। রাতের বেলা বাড়িগুলোতে যখন আলো জ্বলে উঠতো তখন মনে হতো পাহাড়-শ্রেণী বুঝি আলোক-মালা বুকে ঝুলিয়েছে। লাবান, লাইটুমুখরা, নঙথুমাই, বড়বাজার, পুলিশবাজার। স্মৃতি আর স্মৃতি!

আরো আছে। ওয়ার্ড লেক, গলফ্ লিঙ্ক, গ্যারিসন্ গ্রাউণ্ড, বিশপ্, বিডন্, আর সতী ফলস্। লাবানের পথে সেই স্রোতস্বিণী। গ্রীষ্মকালে যার দেহ শীর্ণ। স্বচ্ছ টলটলে জলের নীচে পাথরের টুকরোগুলো ছিলো বড্ডো স্পষ্ট। স্রোতস্বিণীর বুকের ওপর

ঝুল্‌তো সেই নড়বড়ে সেতুটা। বৃষ্টির দিনে সেই শীর্ণ স্রোতস্বিনী হয়ে উঠতো সাংঘাতিক রকম অশান্ত আর চঞ্চল। জলরাশি উদ্দাম বেগে বয়ে চল্‌তো। সামনে যা পড়তো খড়-কুটোর মতো ভাসিয়ে নিয়ে যেতো। ওয়ার্ড লেকের জল ছিলো শান্ত স্থির। দু'দিক সবুজ ঘাসে ঢাকা। অসংখ্য সবুজ গুল্ম লতা। ছোট ছোট পাখী আশেপাশে ঘুরে বেড়াতো। পাশেই ছিলো রোজ গার্ডেন। গোলাপের গন্ধে মৌমাছি আর ভাম্‌রার দল অস্থির হয়ে ছুটোছুটি সুরু করতো।

শিলং ক্লাবে ওয়েস্টার্ণ মিউজিকের তালে তালে রূপসীরা নেচে চল্‌তো। বিডন্‌ বিশপ্‌ ফল্‌সের জল গড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সে কি গর্জন! জলের ওপর সূর্যের আলো পড়ে রামধনুর সৃষ্টি করতো। সহরের একপ্রান্তে ছিলো জেলরোড, অন্য প্রান্ত নিউকলোনী। দু'দিকের পাহাড় থেকে সরু পায়ে-চলা পথ নেমে এসে পাইনের অরণ্যের মধ্য দিয়ে নিজের পথ করে নিয়ে গলফ্‌ লিঙ্কের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। মাঝে মাঝে কাঁটা গুল্মের ঝোপ। কতো রঙের বাহার! পল্লবঘন গাছের নীচে নীচে জমাট অন্ধকার। শৈবালাচ্ছন্ন কালো পাথরের গা বেয়ে বেয়ে জল চুঁইয়ে পড়তো। নিউ কলোনীর পাহাড় থেকে দূরে তাকালে দেখা যেতো পায়ে-চলা পাহাড়ী পথ। নীচে নামতে নামতে দূরে কোথায় যেন হারিয়ে মিলিয়ে গেছে। শিলং। তখনকার দিনে অভিহিত ছিলো "স্কট্‌ল্যাণ্ড অফ দি ইস্ট" নামে। কিন্তু ধীরে ধীরে শিলং-এর অনেক পরিবর্তন হলো। পুরোনো দিনের শিলং-এর সঙ্গে আজকের দেখা শিলং-এর কতো প্রভেদ!

সুপ্রিয় অল্প বয়সে চাকরি নিয়ে প্রথম যখন শিলং-এ এলো, সে অনেক অনেক বছর আগেকার কথা।

কিন্তু তবু সমস্ত কিছু এখনও স্পষ্ট। মনে হয় যেন সেদিনকার ঘটনা। মনের ভেতর নানা ছবি আজো ভীড় করে আছে।

সেদিন নঙ্‌পোর রেঁস্তোরাগুলো ছিলো নোংরা। গৌহাটি থেকে

শিলং যাবার রাস্তার মাঝামাঝি জায়গায় নঙ্‌পো। নঙ্‌পোর তখন দৈন্য-জর্জরিত অতি সাধারণ চেহারা। আজ নঙ্‌পো ফুলে ফেঁপে উঠেছে। কিন্তু সেদিন্ এরকমটি ছিলো না। মোটর, বাস্, ট্রাক্, জীপ্, সব দম নেবার জন্যে, বিশ্রাম করবার জন্যে দাঁড়াতো। হাঁফিয়ে, জিরিয়ে, জল পান করে, পেট্রোল আর মবিলে জঠর ভরিয়ে তবে যন্ত্রযানগুলো ধীরে-সুস্থে রওনা দেবার জন্যে প্রস্তুত হতো। অনেক বাসযাত্রীদের মতোই কেমন যেন অলস্ অলস্ ভাব।

নঙ্‌পোর রেঁস্তোরাগুলোতে যারা ভীড় জমাতো তাদের কেউ যাবে শিলং, কেউ বা গৌহাটি।

নঙ্‌পোর রেঁস্তোরাগুলো খানিকটা সময় মনুষ্য-গুঞ্জনে ভরে উঠতো। সেকেণ্ড ক্লাস আর থার্ড ক্লাস যাত্রীদের ভীড়ে রেঁস্তোরা-গুলো যেন প্রাণ-চঞ্চল হয়ে উঠতো।

সুপ্রিয় তার প্রথম যাত্রাকালে ওই রেঁস্তোরাগুলোর একটাতে এককাপ চা নিয়ে বসেছিলো। ছেলেমানুষ সুপ্রিয় ওই প্রথমবার শিলং-এর পথে চলেছে। আশেপাশে কতো বিভিন্নধরনের লোকের ভীড়। নেই কে ? অসমীয়া, বাঙালী, খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, লুসাই, গারো, নাগা, মণিপুরী, নেপালী। ইংরেজী আর হিন্দী ভাষাভাষী লোকের সংখ্যাও কম নয়। কলকাতার বাইরে তার এই প্রথম আসা। চলে আসার সময় মার চোখদুটো জলে ভেজা ছিলো। কলকাতা ছাড়তে মন চায়নি। কলকাতার অতোটুকুন্ বাড়িতে দম বন্ধ হয়ে মরবে তাও ভালো। কলকাতার বর্ষাতে নর্দমার জল আর রাস্তার জল মিলে মিশে একাকার হয়। সে জল ভেঙে সন্ধ্যেবেলা প্রায় সাঁতার কেটে ঘরে ফিরতে হয়।

র‍্যাশনের চালের সঙ্গে মেশানো পাথরের টুক্‌রো গলাধঃকরণ করে পেটে ইয়া বড়ো বড়ো স্টোন্ জন্মায়। ব্যথা, বিষ আর যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে হয়। অপারেশন করে স্টোন্ বের করবার পর কাঁচের আলমারীতে আবার সযত্নে তা তুলে রাখা হয়। পেটের ভেতরে

জন্ম নেওয়া স্টোনের আকার এবং ওজন সম্বন্ধে আত্মীয়-বন্ধুর কাছে ফলাও করে বলাও হয়। ও যে প্রায় পেটের ছেলের মতো। এই কলকাতায় অফিস-কারখানায় প্রায় প্রতিদিন স্ট্রাইক্ হয়। ঘেরাও হয়। ট্রামগাড়ি লাইনচ্যুত হয়ে গড়িয়ে গিয়ে প্রস্রাবাগারে ঢুকে কর্তব্যরত লোককে ধাক্কা দিয়ে জখম করে। চলন্ত ভীড়ের বাসে উঠতে গিয়ে কেউ কেউ প্রাণ হারায়। কুণ্ডলী-পাকানো গাঢ় কালো ধোঁয়া প্রাণ ভরে নাক দিয়ে টেনে বুকের অসুখে সবাই ভোগে। নানা কারণে ক্যান্সারের আধিক্য নাকি এ শহরে খুব বেশি। কলকাতায় বাস্ আর ট্রামগুলো দিব্যি প্রাইভেট গাড়িগুলোর বুকে চেপে বসে ভেতরের লোকগুলোকে থেৎলে দেয়। কলকাতার লোক বাসে-ট্রামে বসবার এক বিঘৎ জায়গা পেলে অঘটন ঘটেছে বলে সন্দেহ করে। ফুটপাতে হাজার লোক দিব্যি পড়ে পড়ে ঘুমিয়ে রাত্তির কাটিয়ে দেয়। রাতের কলকাতায় মনুষ্য-দেহধারী বাঘ-সিংহের দল শিকারের লোভে ঘুরে বেড়ায়। কলকাতা মহানগরীতে গয়লা ভুল করে এক বাল্তি জলের মধ্যে কয়েক ফোঁটা দুধ মিশিয়ে দেয়।

গমের সঙ্গে বিষাক্ত বীজ চূর্ণ করে দিব্যি হাস্তে হাস্তে মিলিয়ে দেয়। নোটিশ না দিয়ে হাজির হয় কলেরা-বসন্ত। অতি সহজে অনেক সহস্র লোককে ধরাধাম ত্যাগ করতে বাধ্য করে। যেখানে এত দুঃখ-কষ্ট, যেখানে জীবন নিয়ে জুয়োখেলা চলে, যেখানে পায়ে পায়ে মৃত্যু ঘুরে বেড়ায়, সেই কলকাতা ছাড়তে বাঙালী সন্তানের বড্ডো কষ্ট। মনটা কেমন কেমন করে। দৃষ্টি উদাস্ হয়। মনে হয় প্রেমিকার কাছ থেকে সে যেন বিদায় মাগ্ছে। বাইরে গিয়ে মন দু'দিনও টেঁকে না। ঘরে ফেরবার জন্যে প্রাণ ছট্ফট্ করে।

ক্লাইভ আর ওয়ারেন হেস্টিংস যে কি জাদুদণ্ড কলকাতার বুকে ছুঁইয়েছিলেন তা বলা শক্ত। কলকাতার সড়কে আর রাজপথে আলোর রোশ্নাই দেখতে দেখতে কতো লোক, কতো ভিখিরী না খেয়ে, রোগশোকে ভুগে, বাবুদের গাড়ির নীচে পড়ে প্রাণ হারায়। এ মৃত্যুতে নাকি সুখ আছে। শান্তি আছে। শরণার্থীরা দণ্ডকারণ্যের

তাজা মুলো, শশা, কুমড়ো, লাউ-এর হাতছানি অনায়াসে ভুলে থাকে। আন্দামানের নির্জনতার ভেতর দমবন্ধ হয়ে মরবার চাইতে এ মৃত্যু তাদের কাছে অনেক লোভনীয়। অনেক শ্রেয়। তাই শত প্রলোভনেও এখনকার বাসিন্দারা সহজে কলকাতা ছাড়তে রাজী হয় না। চলে গিয়ে আবার ফিরে আসে। সুপ্রিয়রও প্রথমবার কলকাতা ছাড়তে মন চায়নি।

নঙ্‌পোর পথের ওপর সেদিন সারবন্দি দাঁড়িয়ে ছিলো মোটর আর বাস। শিলং থেকে গৌহাটি, আর গৌহাটি থেকে শিলং। তখনো শিলং-গৌহাটির স্টেট্‌ ট্রান্সপোর্ট জন্ম নেয়নি। প্রাইভেট কোম্পানীর ওপর ন্যস্ত ছিলো সমস্ত ভার। দায় আর দায়িত্ব। সমস্ত কর্তৃত্ব ন্যস্ত ছিলো বোর্ড অব ডাইরেক্টার্সের ওপর। ফার্স্টক্লাস যাত্রীদের জন্যে ভালো দামী মোটর। বাকি সব বাস। এদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়ুতো প্রাইভেট মোটর। টি গার্ডেন আর তেলের অফিসের সাহেব, বড়োবাবু আর মেজোবাবুদের সব গাড়ি। চকচকে। ঝকঝকে। নওগাঁ, জোড়হাট, শিবসাগর আর লখিমপুরের যাত্রীরা ছুটেছে শিলং শৈলাবাসের দিকে। তারা ছুটেছে শৈলাবাসের মজা লুটতে।

ফার্স্টক্লাসের যাত্রীদের জন্যে সাজানো-গোছানো ছিম্‌ছাম্‌ সব রেঁস্তোরা। লন্‌-এ লাল, নীল, সবুজ ছাতার নীচে বসে সাহেব আর মেমসাহেবরা চা-পান করছে। নঙ্‌পোর রেঁস্তোরায় বসে তারা পার্থ, হনোলুলু, শিকাগো আর গ্লাসগোর গল্প করছে। ভারত তখন সবে-মাত্র স্বাধীনতা পেয়েছে। সাহেবরা তখনো ভারত ত্যাগ করেনি। তবে এদেশ ছাড়বার তোড়জোড় চলেছে। বাক্স-পেটরা গোছাচ্ছে। চোখের জল বার বার মুছ্‌ছে। বউকে এক-একবার চুমো খাচ্ছে। তারপর দড়িদড়া নিয়ে জিনিসপত্তর বাঁধছে।

এদিকে নঙ্‌পোর সড়কে ড্রাইভার আর কণ্ডাক্টারের দল গাড়ি নিয়ে ব্যস্ত। অয়েল, গ্রীজ মেখে লোকগুলো ভূত সেজে বসে আছে। মেকানিকের দল বাস আর জীপের নীচে শুয়ে সমস্ত কলকব্জা পরীক্ষা করছে।

প্লেন্‌সের গরম, ধোঁয়া-ধুলো, মশা-মাছি থেকে মুক্তি পাবার জন্যে যারা ওপরে উঠে যাচ্ছে তাদের মুখে কেমন একটা হাসি হাসি ভাব। আর যারা নীচে, মানে গরমের দেশে নেমে যাচ্ছে তাদের মুখগুলো কেমন যেন ম্লান। গরম কোট আর সোয়েটার শরীর ছেড়ে কাঁধে দোল খাচ্ছে।

আমিনগাঁ থেকে পাণ্ডু। তখনকার দিনে ব্রহ্মপুত্র স্টীমারে পার হতে হতো। আজকের মতো ব্রহ্মপুত্রের ও'পর সেদিন ওভারব্রীজ তৈরী হয়নি। ট্রেণও চলতো না। সকালবেলা স্টীমার ধীরে ধীরে জল কেটে অগ্রসর হচ্ছিলো। এগিয়ে যাচ্ছিলো ঠিক রাজহংসের মতো জল কেটে কেটে। ভোরের সোনালী আলো কে যেন মুঠো মুঠো স্টীমারের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছুঁড়ে মেরেছে। সেই শরীর জুড়ানো, প্রাণ মাতানো, মিষ্টি হাওয়া ভারী ভালো লাগ্‌ছিলো সুপ্রিয়র। পাণ্ডুতে পৌঁছে বাসে চড়তে হয়েছিলো। বাস দৌড়েছিলো গৌহাটি স্টেশনের দিকে।

আসামের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছড়ানো ছিটানো রয়েছে অনেক পুরোনো ইতিহাস। স্টীমারে বসে এক অসমীয়া ভদ্রলোকের কাছে তার অনেকখানি সুপ্রিয় শুনেছিলো। পরে সে আসাম সম্বন্ধে নিজেও অনেক পড়াশুনো করেছিলো।

পুরোনো কালের রাজা নরক প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের পত্তন করেছিলো। সে নগর আজ গৌহাটি নামে পরিচিত। পুরোনো দিনের কামরূপের রাজধানী ছিলো এই প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। সপ্তম শতাব্দীতে কামরূপের ইতিহাস বলে গেছেন চৈনিক ভ্রমণকারী হিউ এন্‌ চ্যাং। কনৌজের হর্ষবর্ধন আর গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের সময় ভাস্করবর্মা কামরূপের কর্তা ছিলেন। ষষ্ঠদশ শতব্দীতে নরনারায়ণের শৌর্য-বীর্যে আসাম ভরপুর ছিলো। অহোম রাজারা মোগল সৈন্যদের বেশ কয়েকবার পরাজিত করেছিলেন। মোগল সৈন্য আসাম প্রান্তরে বন্যার জলে নাস্তানাবুদ হয়ে, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর এবং আরো নানারকম ব্যাধিতে কাতর হয়ে, ভয়াবহ অরণ্য, পর্বত-কন্দরে পথ হারিয়ে, শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে

শত্রুসৈন্য কর্তৃক
সহ্য করতে না। (
১৮২৬ খ্রীষ্ট
ব্রহ্মপুত্রের তী
ছড়িয়ে আ
রাজা বানি
করে নতুন
প্রবাদ
দেওয়া হয়
তাতেই ভ
গুরুত্বপূর্ণ।
ব্রহ্মপু
মন্দির।
আসাম
স্রোতের
পূর্বে ডিব
পরে ডি
প
ধুয়েছি
আজ
এসেছে
স্মৃতিপটে
পথে পায়
গুলোর ছ
গাইছিলো
ভদ্রলোকে
গাইছিলো
বীরত্ব কা

ণ করে। এ
াম জেনারেল
হলো গানের
ল। মোগল
া। লাচিত
। অপরাধ!
কাজ উনি
ড়া নয়।"

বাক্-বিতণ্ডা
। ব্রেকটা

য়ে করে
ল দিয়ে
অসমীয়া
না।
আসাম
শিলং
যথেষ্ট
র মিষ্টি
র পেলেই

গয়েছিলো।
ণ্টার ভেতর
শ্বশুরবাড়ি
অসমীয়া

ভদ্রলোকটি আসামে প্রচলিত গহনা আর পোশাক-পরিচ্ছদের এক ফিরিস্তি পেশ্ করেছিলো। না হলে সুপ্রিয় অতো-শতো জান্‌বে কি করে!

মেখলা, চাদর আর রিহা শোভিতা হয়ে বউটি এসে তাদের পাশে বসেছিলো। তার শরীরে সোনার গহনাগুলো ঝক্‌ঝক্ ঝক্‌ঝক্ করছিলো। তাদের বিভিন্ন সব নাম। ডুগ্‌ডুগ্‌গী, বেনা, ঢোলবিরি, লোকাপারা, গামখারু, চিটি পিথি। কণ্ঠ, কর্ণমূল, বাহুতে ওর শোভা পাচ্ছিলো। সর্বশেষ কোপালি বা মাথায় পড়বার ছোট্ট মুকুট। স্বামীর আদেশ পেয়ে ট্রাঙ্ক্ থেকে বের করে বউটি সুপ্রিয়কে দেখিয়েছিলো।

বেতের চেয়ারে বসে সাহেব, মেমসাহেবরা চা পান করছিলো। সেখানে সেদিন ছিলো ভারত সরকারের অনেক প্রথম শ্রেণীর অফিসার। ব্যবসায়ী আর ফার্মের ডাইরেক্টররা সুন্দরী স্ত্রী আর কন্যা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে চা পান করছিলো। বয়-বেয়ারার দল ছিলো ব্যস্ত আর ত্রস্ত। নঙ্‌পোর শান্ত জীবন ঘণ্টাখানেকের জন্যে হয়ে উঠেছিলো চঞ্চল আর অস্থির। বাস, মোটর, ট্রাক্‌গুলো চলে গেলে আবার ওখানে স্তব্ধতা নেমে আস্‌বে। নঙ্‌পো তখন আবার ঘুমোবে, ঝিমোবে। বাসগুলো আগে ছাড়বে। তারপর প্রাইভেট গাড়িগুলোর পালা। সবশেষে ফার্স্ট ক্লাশের যাত্রী বোঝাই ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে মোটরগুলো। চা বাগানের আর তেল কোম্পানীর সাহেব-সুবোরা ধীরে-সুস্থে চা পান করছিলো। মন্থর হস্তে সিগারেটের ছাই ঝাড়ছিলো। তখনকার দিনে চা বাগান আর তেল কোম্পানীর সাহেব-সুবোদের ছিলো অনেক সুযোগ-সুবিধে। অনেক স্বাচ্ছন্দ্য। এক-একটা চা বাগানের এক-একজন মালিক ছিলো যেন এক-একজন একচ্ছত্র অধীশ্বর। এদের সঙ্গে অবশ্য ছিলো কিছু-সংখ্যক ভারতীয় মালিক। "টু লিভস্ এ্যাণ্ড এ বাড্।" চা-এর চাহিদা কতো!

একটার পর একটা চা বাগান। শিবসাগর, লখিমপুরের

অনেকটা এলাকা জুড়ে বিরাট সব চা বাগান। চা গাছগুলোর মাথা সমান আর সুন্দর করে ছেঁটে দেওয়া হয়েছে। যতো দূর দেখা যায় শুধু বাগান আর বাগান। মাঝখান দিয়ে সমান্তরাল রেখায় সরু পথ চলে গেছে। চা নাকি ভারতবর্ষে আসে ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে। বারমিস্ আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে। চা বাগানের মালিকদের সঙ্গে সমস্ত কিছুতে পাল্লা দিতো তেল কোম্পানীর মালিকেরা।

সুপ্রিয় পরে জেনেছিল যে, ডিগবয়ের তেলকুপ নাকি নিঃশেষিত, অবশ্য নূতন নূতন অনেক কূপের সন্ধান মিলেছে। যেমন রয়েছে নাহারকাটিয়া, মোরান আর রুদ্রসাগর। ডিগবয়ে তেল সংগ্রহের ইতিহাসটা সত্যি অদ্ভুত। বনের কাঠ বহন করে ফিরছিলো পোষা হাতীর একটা দল। এদের মধ্যে একটা হাতী পায়ের জল-কাদা ডোবার জলে পরিষ্কার করতে গিয়ে সারা পায়ে তেল মেখে নিয়ে এসেছিলো। সেই থেকে তেলের খোঁজ বেরুলো। সুপ্রিয় ভাবছিলো তার প্রথম মাসের মাইনের টাকাটা সে কিভাবে ভাগ করবে। সংসারে অভাবের ফুটোটা ছিলো প্রকাণ্ড বড়ো।

সুপ্রিয় খানিকটা সময় অন্যমনস্ক ছিলো। হঠাৎ চেঁচামেচি আর গোলমাল শুনে সে পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হবার চেষ্টা করেছিলো। সে দেখলো একটা ষাঁড় দৌড়ুচ্ছে। আর ষাঁড়ের ঠিক পুরোভাগে শ'খানেক হাত দূরে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে দৌড়ুচ্ছে একটি মেয়ে। পরনে তার ছিলো লাল স্কার্ট। মাথায় বব্‌করা চুল। রং ধব্‌ধবে ফর্সা। সুশ্রী একটি বিশ-বাইশ বছর বয়সের মেয়ে ষাঁড়ের তাড়া খেয়ে দৌড়ুচ্ছিলো। মেয়েটি দৌড়িয়ে এসে সুপ্রিয়র ঠিক পেছনে চলে যায়, আর তারপর অতর্কিতে দু'হাত দিয়ে সুপ্রিয়কে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরেছিলো। ষাঁড়টা শিং বাগিয়ে সোজা সুপ্রিয়র দিকে ছুটে এসেছিলো। ভাববার আর এতোটুকু সময়ও নেই। স্রেফ্ ঘাড় থেকে মেয়েটি ঝুল্‌ছিলো। সুপ্রিয় বুঝতে পেরেছিলো যে, ষাঁড়ের শিং-এর খোঁচায় অল্প টাকা মাইনের কেরাণীর রক্তাক্ত দেহটা মাটিতে লুটিয়ে পড়বে। প্রথম মাসের মাইনেটা পর্যন্ত ভোগে

লাগবে না। সুপ্রিয়র ভাববার সময় ছিলো না। অস্ত্র হিসেবে তার হাতে সম্বল মাত্র একটা ছাতা। কালো রঙের ছাতা। চোখ বন্ধ করে "জয় দুর্গা" বলে ছাতাটা সুপ্রিয় খুলে ধরে। তারপর অপেক্ষা করতে থাকে ষাঁড়ের শিং-এর কঠিন স্পর্শের জন্যে। ভেবে-ছিলো তীক্ষ্ণ একটা কিছু এসে ওই মুহূর্তে তার পেটটা ফাঁসিয়ে দেবে। পেট ফুটো হবার আর সেকেণ্ড কয়েক মাত্র বাকী। কিন্তু না, পেট ফুটো হলো না। কি আশ্চর্য, যা ভেবেছিলো তা ঘট্‌লো না তো! ছাতা সরিয়ে সুপ্রিয় ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করলো। ষাঁড়টা সুপ্রিয়র হাত দশেক দূরে এসে থমকে দাঁড়িয়ে-ছিলো। তার বরাবর লক্ষ্য ছিলো মেয়েটার লাল স্কার্টটার ওপর। কালো ছাতা তার পছন্দ হয়নি। ঘোরতর বর্ণ-বিদ্বেষ! তাই খানিকক্ষণ ঘাড় নীচু করে ষাঁড়টা দাঁড়িয়ে থেকে বোধকরি ক্লান্ত আর শ্রান্ত হয়ে এবং অসম্ভব বিরক্ত হয়ে পাশের রাস্তা ধরে সামনের দিকে চলে গেলো।

মেয়েটা কিন্তু তখনো সুপ্রিয়র পেছন থেকে দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে ঘাড় থেকে ঝুল্‌ছিলো। ওর বুকের নরম মাংসের চাপে সুপ্রিয় পিষ্ট হচ্ছিলো। ওর গরম নিঃশ্বাস পড়ছিলো সুপ্রিয়র ঘাড়ে, পিঠে। সেই সঙ্গে সেণ্ট পাউডারের হাল্‌কা মিঠে গন্ধ হাওয়ায় ভেসে এসে নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করে বিহ্বল করে তুলেছিলো সুপ্রিয়কে। তুল্‌তুলে মাংসপেশীর চাপ, মন্দ নয়। সুপ্রিয়র মনে হচ্ছিলো অনেকটা সময় ষাঁড়টা তার সামনে উগ্রমূর্তি ধরে দাঁড়িয়ে থাক্ না! হোক্ না ষাঁড়ের সময়ের খানিকটা অপচয়! তাহলে মেয়েটা অনেকক্ষণ তার ঘাড় ধরে ঝুলে থাকতে পারবে। মেয়েটার কচি কোমল বুকের স্পর্শ পেতে পেতে কেটে যাবে অনেকটা সময়। সারাটা দিন যদি ওভাবে কেটেই যেতো তাতেই বা মন্দ কি ছিলো! মুছে যেতো তার সামনে থেকে গোটা নঙ্‌পোটা। ষাঁড় নামক ভয়াবহ জীবটার অস্তিত্ব বিস্মৃত হতে সময় লাগতো না এতোটুকুও। মুছে যেতো বর্তমান,

অতীত আর ভবিষ্যৎ। স্পর্শ-কাতর দেহটার ভেতর চঞ্চল মনটা শান্ত সংযত করবার আগেই লোকজন ছুটে এসেছিলো। মেয়েটি ততোক্ষণে হাতের বাঁধন আল্‌গা করে দিয়েছিলো। দেহের চাপ থেকে দিয়েছিলো সুপ্রিয়কে মুক্তি। মেয়েটি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচ। ওর মোটে লজ্জা ছিলো না। কুণ্ঠা ছিলো না। সমস্ত কিছুই নিয়েছিলো নিতান্ত সহজ সরলভাবে। ভাবখানা যেন কিছুই হয়নি। সুপ্রিয় যেন তার অনেক দিনের পরিচিত।

সুপ্রিয়র হাত দুটো নিজ হাতে তুলে নিয়ে তাতে ঝাঁকুনি দিয়ে মেয়েটি বলেছিলো—"ব্রাভো! নাম কি তোমার?"

পরক্ষণেই অনায়াসে এবং অম্লানবদনে একটি ছোট্ট মিষ্টি মধুর চুমু মেয়েটি সুপ্রিয়র গালে এঁকে দিয়েছিলো। ছোট্ট, মিঠে, মধুর, হাল্‌কা, ঝরঝরে, উষ্ণ একটি চুমো। সুপ্রিয় লজ্জায় লাল। সেই মুহূর্তে তামাম বিশ্বের সমস্ত ষাঁড়গুলোকে নেহাতই আপনজন বলে তার মনে হয়েছিলো। তার দুঃখ হয়েছিলো এই ভেবে যে, স্কুলের খাতায় গরু সম্বন্ধে সুপ্রিয় একসময় অনেক তথ্য পরিবেশন করেছিলো। ষাঁড়কে সে সময় মোটেও কোনোরকম গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। দেওয়া হয়নি বলে সেদিন সে ভীষণভাবে অনুতপ্ত বোধ করেছিলো। ওই মুহূর্তে লিখতে হলে ষাঁড় সম্বন্ধে সে অনেক কিছু লিখে ফেল্‌তো। গরুর চেয়ে ষাঁড় যে কম উপকারী নয়, সে সম্বন্ধে সেদিন সে নিঃসন্দেহ হয়েছিলো।

সুপ্রিয় মেয়েটির নাম পরে জেনেছিলো। ওর নাম ছিলো রোজ লিংডো। জাতিতে খাসি। শিলং-এর স্থায়ী বাসিন্দা। বাসে ওরা দু'জন পাশাপাশি বসেছিলো। কোনো কারণবশতঃ বাস গন্তব্যস্থল অভিমুখে রওনা হতে দেরী করছিলো। রোজ লিংডো কথা বল্‌তে বল্‌তে সুপ্রিয়র হাতটা নিজ হাতে বার বার তুলে নিচ্ছিলো। সুপ্রিয় ইচ্ছে করেই হাত সরিয়ে নেয়নি। মেয়েটি ছিলো উঁচুদরের সুন্দরী। ওর কাছ থেকে সুপ্রিয় সেদিন খাসিদের সম্বন্ধে, জয়ন্তিয়াদের সম্বন্ধে অনেক কিছু

জেনেছিলো। জেনেছিলো তাদের রীতি-নীতি আর আচার-ব্যবহার।

সেডুল্ টাইমে গাড়িগুলো নঙ্পো ছেড়ে রওনা হলো না। বাসের মেরামতির কাজ হয়তো তখনো শেষ হয়নি। তেল, জল, মবিলে উদর পুরিয়েও হয়তো যানবাহনগুলো ক্লান্তি, শ্রান্তি ও অবসাদের বোঝা ঘাড় থেকে নামাতে পারেনি। তাতে কোনো ক্ষতি নেই। রোজ লিংডোর সঙ্গে গল্প করে সময় সুপ্রিয়র ভালোভাবেই কেটে যাচ্ছিলো।

কলকাতা ছেড়ে প্রথমবার পাথুরে মাটির পরশ। গভীর সবুজ অরণ্যের হাতছানি। দূর-দিগন্তের ধূসর গিরিশ্রেণীর নয়নাভিরাম শান্ত সমাহিত পরিবেশ। শৈলাবাসের মাধুর্যমণ্ডিত মন জুড়িয়ে দেওয়া অনাস্বাদিত আবহাওয়ার আকর্ষণ। পূর্ব সীমান্তের এতোগুলো অঞ্চলের বাসিন্দাদের বিচিত্র সমাবেশ মনটাকে যেন অন্য এক জগতে স্থানান্তরিত করেছিলো। ভালোই লাগ্ছিলো সুপ্রিয়র। আরো ভালো লাগ্লো যখন রোজ লিংডো বাসের সামনের সীটে এসে তার পাশে ঝুপ্ করে বসে পড়লো।

নতুন সাজ ওর অঙ্গে। ব্লাউজ, স্কার্ট অদৃশ্য হয়েছিলো। সেখানে সর্বাঙ্গ ঢেকে শুধু মুখখানা বের করে রোজ লিংডো এসে হাজির হয়েছিলো। সুপ্রিয়র ওকে চিনতে কষ্ট হয়। ওর অঙ্গভূষণ বোরখার সঙ্গে প্রায় পাল্লা দিয়েছিলো। এ যেন পুরুষের কামবহ্নির আর লালসার হাত থেকে আত্মরক্ষার সযত্ন প্রয়াস। ঘরের বউ-এর ঠিক যেন শাক দিয়ে ভালো মাছের টুক্রোকে অন্যের লুব্ধ দৃষ্টি থেকে লুকোবার প্রচেষ্টা। সবটা ঢাকতে পারেনি। মুড়োটা বেরিয়ে হাস্ছে। রোজের মুখখানা প্রবল আকর্ষণ সৃষ্টি করবার স্পর্ধা রাখে। ছাইচাপা দিয়ে হীরকখণ্ডের দ্যুতি লীন করার প্রচেষ্টা যেন ব্যর্থ হয়েছিলো।

—"একি! একি করেছো?" বলেছিলো সুপ্রিয়।

—"তোমার মতো লোকেদের বিষদৃষ্টি থেকে বাঁচবার প্রয়াস।"

উত্তর দিয়েছিলো লিংডো। সপ্রতিভ মেয়েটি। ওর কথাগুলো কেমন যেন ঝাল ঝাল আর মিষ্টি মিষ্টি।

অল্প সময়ের মধ্যে মেয়েটি এতো সহজ সরল হয়ে উঠ্লো কি করে? ভেবেছিলো সুপ্রিয়।

—"ইস্, কাঁধ ধরে ঝুলে পড়তে যে এতোটুকুন্ ইতস্তত: করলে না! সরমে যে তখন মোটেও বাধলো না; আর ষাঁড়ের প্রস্থানের পরও অনেকটা সময় ছেলেটার মুণ্ডু চিবিয়ে চিবিয়ে খেলে। কই, তখন লজ্জা-সরম কোথায় ছিলো?"

কথার চাবুক খেয়ে সুপ্রিয় গোভাতে রাজী নয়। চাবুক ঘুরিয়ে মারতে সে সক্ষম হয়েছিলো। সুপ্রিয় আর রোজ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে কথাবার্তা বল্‌ছিলো।

—"বিপদ বুঝে স্ট্রাটেজীর আশ্রয় নিয়েছিলাম। ষাঁড়ের শিং-এর চেয়ে বন্ধুর গলা জড়িয়ে থাকা অনেক শ্রেয় এবং অনেক বেশি নিরাপদ বলে মনে হয়েছিলো।"

হাসিতে মেয়েটি মুক্তো ছড়াচ্ছিলো। ফরসা মুখখানাতে একটি সুশ্রী তিল আর নরম মসৃণ মাংসল গালে ছোট্ট একটি টোল ওর রূপের জৌলুস অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছিলো।

—"যখন ভাবছো মেয়েটি অন্যায়ের সুযোগ নিয়েছে তখন তাকে কাঁধ থেকে অনায়াসে ফেলে দিতে পারতে! ফেলে দিতে পারতে ষাঁড়ের শিং-এর কাছে! তাছাড়া ষাঁড় বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে ও কাজটি তুমি অনায়াসে সারতে পারতে! কই বাপু, তা তো করলে না? বোধ করি খেয়ালই ছিলো না যে, ষাঁড়টি চলে গেছে অনেকক্ষণ।" বলে রোজ। ওর কথায় চমক ছিলো। মজা ছিলো। জৌলুস ছিলো।

—"বাঃ, বেশ উল্টো অনুযোগ দেওয়া হচ্ছে! আমার তাহলে উচিত ছিলো তোমাকে ষাঁড়ের কাছে ফেলে দেওয়া!"

সুপ্রিয় কথার জাল বুন্‌ছিলো।

—"তাই দিলে পারতে! তারপর সারাজীবন অনুশোচনার আগুনে জ্বলে-পুড়ে মরতে।"

মেয়েটা মনের খেলায় মাতলো নাকি? ভেবেছিলো সুপ্রিয়।

—"তোমার ভাবভঙ্গী দেখে মনে হয়েছিলো যে, তোমার কস্মিন-কালেও ঘাড় থেকে নামবার ইচ্ছে ছিলো না।"

সুপ্রিয়র তীক্ষ্ণ মন্তব্য।

—"তুমি বোধ করি জানো না যে, আমাকে একবার কাঁধে তুললে অনেকেই আমাকে কাঁধ থেকে আর সহজে নামাতে চাইবে না। চেষ্টা করবে গদী বানিয়ে কাঁধে বসিয়ে রাখতে।" মেয়েটি একগাল হেসে বলেছিলো।

—"কাঁধে চড়বার সখ যে প্রচুর!"

—"তা সময়-সুযোগ বুঝে একটু-আধটু চড়তে হয় বৈকি!" উত্তর দিয়েছিলো রোজ লিংডো।

বলে কি মেয়েটা! ওর অন্তরে দম্ভের সদর্প মাতামাতি, ওর নিজ সৌন্দর্য আর যৌবন সম্বন্ধে টন্‌টনে জ্ঞান। পুরুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে নিজের পাব্‌লিসিটি দিতে ও বেশ ভালোভাবেই জানে।

—"জানো, বিয়ের বাজারে এই মেয়েটি কিরকম শাঁসালো ক্যান্‌ডিডেট্‌!"

—"চেহারা দেখে তা স্পষ্টই বুঝতে পারছি।"

—"না না। সবটা তা নয়। খাসি পরিবারে আমি সবচেয়ে ছোট মেয়ে। জানো বোধ হয় খাসিদের ভেতর ছোট মেয়ে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হয়। সেইজন্যে সর্ব-কনিষ্ঠা মেয়ের অনেক আদর-যত্ন। খাতির আর আপ্যায়নের জ্বালাতে তাকে অস্থির হতে হয়। উঠ্‌তি বয়সের ছেলেগুলো বড্ডো জ্বালায়। তাদের এক চোখ থাকে ছোট মেয়ের দিকে, অন্য চোখ পরিবারের ধন-সম্পত্তির দিকে।" রোজ লিংডো হাস্‌তে হাস্‌তে সব বল্‌ছিলো।

—"ইন্‌টারেস্টিং!" সুপ্রিয় আরো শুনবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলো।

—"খাসি-গোষ্ঠী মাতৃতান্ত্রিক্। সবচেয়ে ছোট মেয়েটি মার বসতবাড়ির মালিকানার সঙ্গে বিষয়-সম্পত্তির সমস্ত ভার বুঝে নেয়। বিয়ের পরে স্বামীকে এসে স্ত্রীর বাড়িতে বসবাস করতে হয়। এখানে স্ত্রী সর্বেসর্বা। সুতরাং বুঝতেই পারছো, আমি যখন সংসারের ছোট মেয়ে, আর ঘাড় ধরে আমি যদি ঝুলেই পড়ি তাহলে তোমার শঙ্কিত হবার কোনো কারণ নেই। বরং সুখী হওয়াই উচিত।"

—"অনেক বেশি ভেবে নিয়েছো! এতো অল্প সময়ে এতো বেশি ভাবা ঠিক হয়নি। এবার বলো দেখি সারা অঙ্গে কতো গজ কাপড় জড়িয়েছো? স্কার্ট আর হাত-কাটা ব্লাউজে চোখ ধাঁধিয়ে, উরু আর বগলের পাব্‌লিসিটি দেবার পরে এ যে একেবারে টোটাল্ ব্ল্যাক্-আউট্! ব্যাপারটা কি?" জিজ্ঞাসা করেছিলো সুপ্রিয়।

—"আরে, এ আমাদের খাসিদের ন্যাশানাল ড্রেস্। আগেরটা ছিলো বিদেশী। এ ড্রেস্ সম্পূর্ণ দিশী, নিজস্ব ব্যাপার। শিলং ছেড়ে বাইরে গিয়েছিলাম। মেমসাহেব সাজতে হয়েছিলো। এবার ঘরের মেয়ে ঘরে ফিরছি। শুধু ফেরা বল্‌লে ঠিক হবে না। বাস থেকে নেমে সোজা যাবো একটি খাসি-পরবে যোগ দিতে। পরবের নাম—'সাড্-সুক্-মিন্‌সিয়েম্।' খাসি নৃত্য-গীতের উৎসব। যেখানে নাচের মাধ্যমে প্রীতি, প্রেম, সহৃদয়তা, মনের প্রফুল্লতা ছড়িয়ে ঈশ্বরের চরণে ভক্তিঅর্ঘ্য এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।" এর পরে রোজ লিংডো খাসি পোশাক-পরিচ্ছদের এক ফিরিস্তি দিয়েছিলো, একটার পর একটা।

এতোগুলো বস্ত্রখণ্ড জড়াবার কারণ শীত থেকে আত্মরক্ষার প্রয়াস। "তাপ্‌মঅ" নামে একখণ্ড কাপড় দিয়ে ওরা মাথা, গলা ও বুক ঢেকে রাখে। বাকি জামা-কাপড়ের নাম সুপ্রিয়র আজ আর মনে নেই।

বাস ছাড়তে দেরি হচ্ছিলো। কেন দেরি হচ্ছিলো কারণটা বোঝা যাচ্ছিলো না। নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। খাসিরা নাকি মন্‌খামের গোষ্ঠীভুক্ত। মন্‌খামের গোষ্ঠীর লোকেরা নাকি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে নবম শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর ভেতর এক প্রবল পরাক্রমশালী রাজ্যের স্থাপনা করেছিলো। এরা নাকি মালয় পেনিনসুলা থেকে কম্বোডিয়া পর্যন্ত ছড়িয়ে ছিলো। কম্বোডিয়া থেকেই নাকি খাসিদের পূর্বপুরুষ পাটকই পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করে ভারতের অভ্যন্তরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করেছিলো।

রোজ লিংডো সেরকমই বলেছিলো। মালয়ের অধিবাসী, ছোটনাগপুরের আদিবাসী এবং খাসি পাহাড়ের লোকগুলোর ভেতর নাকি যথেষ্ট চরিত্রগত এবং ভাষাগত সাদৃশ্য রয়েছে। লিংডোর নাকি ভারতের বাইরের দেশগুলো দেখবার অদ্ভুত বাসনা ছিলো। পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানবার তার ছিলো যথেষ্ট ইচ্ছে। ইতিহাসের জীর্ণ পাতা ঘেঁটে, শিলালিপির রহস্য-জাল ভেদ করে, মাটির নীচে খননকার্য চালিয়ে খাসিদের সম্বন্ধে একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করার তার বড্ডো সখ ছিলো। এ সম্বন্ধে নাকি রাতদিন সে ভাবতো।

অস্ট্রিক্ পরিবারভুক্ত এ গোষ্ঠীর ইতিহাস রচিত হওয়া উচিত এবং এ কাজটা রোজ লিংডো নিজ হাতে তুলে নেবে এরকমই ছিলো তার ইচ্ছে। তার চেহারায় ছিলো আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ। রোজ দরকার হলে এর জন্যে সমস্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ঘুরে বেড়াবার জন্যে প্রস্তুত ছিলো। সে খাসিদের সম্বন্ধে আরো অনেক কাহিনী শুনিয়ে-ছিলো। ইউ-টিরুট্-সিং-এর কাহিনী শোনাবার সময় ওর চোখ জ্বলে উঠেছিলো।

১৮৩০ থেকে ১৮৩৩ সাল। পার্বত্য নৃপতি ইউ-টিরুট-সিং কিভাবে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রাম চালিয়েছিলো তারই ইতিহাস মেয়েটি বলেছিলো। ব্রিটিশরা নাকি এর অনেক আগে থেকেই সিয়েম বা খাসি নৃপতিদের সংস্পর্শে এসেছিলো।

ত্রিশজন খাসি নৃপতি সম্বন্ধে, তাদের প্রত্যেকের ইতিহাস খানিকটা করে রোজ সুপ্রিয়কে শুনিয়েছিলো। কোনো কোনো সিয়েম নাকি একটা নিয়ম চালু করেছিলো, যেটা শুনে সুপ্রিয় রোমাঞ্চ অনুভব করেছিলো। অনেক সময় এমন অনেক কিছু ঘটেছে যা সত্যিকার চমকপ্রদ ঘটনা। উত্তরাধিকারীর অভাবে সমতল অঞ্চল থেকে কোনো হতভাগাকে অপহরণ করে তাকে দুর্গম অঞ্চলে টেনে নিয়ে গিয়ে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হতো। এ মাঝে মাঝেই ঘটেছে। অনেক সময় এ কাজ সমাধান করবার জন্যে ডাক পড়্‌তো কোনো এক হাতী-বাবাজীবনের। হাতীটা মাথায় তেল-সিঁদুর লেপ্‌টে, শুঁড়টাকে বাগিয়ে ধরে, পিঠে গদী চাপয়ে সোজা ছুট্‌তো নৃপতি অন্বেষণে।

সুপ্রিয় ভেবেছিলো সে-সব দিনগুলো কি আর ফিরে আস্‌বে না তারা? যা গেছে তা যাক্। ভেবে আর লাভ কি বলো!

হঠাৎ গোটা কয়েক বন্দুক গর্জে ওঠার শব্দে সমস্তটা অঞ্চল সচকিত হয়ে উঠেছিলো। পর-পর কয়েকবার গুলির শব্দ। কে গুলি করলো? কাকে গুলি করলো? কোথায় গুলি করা হলো? সবাইকার কণ্ঠে সেই একই প্রশ্ন। উত্তর দেবার লোক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিলো না।

রোজ যেন কিরকম ম্রিয়মাণ হয়ে গিয়েছিলো। ভয় পেয়েছিলো বোধ হয়। তার সেই প্রতিভাদীপ্ত, উজ্জ্বল্, সুন্দর, মুখখানা নিমেষে কালো হয়ে চুপ্‌সে গিয়েছিলো। চোখে-মুখে ভীতি, ভয়, ভাবনা এসে জাঁকিয়ে বসেছিলো। মেয়েছেলে, ভয় পাওয়া স্বাভাবিক, ভেবেছিলো সুপ্রিয়। সে জিজ্ঞাসা করেছিলো—"বল্‌তে পারো কোন্‌দিক থেকে গুলির আওয়াজ ভেসে এলো?"

দূরে অরণ্যানীর দিকে অঙুলি বাড়িয়ে ধরে রোজ উত্তর দিয়েছিলো—"মনে হচ্ছে ওদিক থেকে। হয়তো কেউ কাউকে গুলি করেছে।" রোজ ইতিমধ্যে নিজেকে অনেকটা সামলিয়ে নিয়েছিলো।

—"কিন্তু এ সময়ে, এ অবস্থায় গোলাগুলির কি দরকার ছিলো?"

সুপ্রিয় জিজ্ঞাসা করেছিলো। আশেপাশের লোকজন ইতিমধ্যে দৌড়ঝাঁপ সুরু করে দিয়েছে। একটা সাংঘাতিক ব্যস্ততা আর ত্রস্ততা মুহূর্তে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। সমস্ত আবহাওয়ায় একটা পরিবর্তন এনে দিয়েছিলো।

—"আমার কি মনে হচ্ছে জানো!" রোজ বলেছিলো।

—"কি?" প্রশ্ন করে সুপ্রিয়।

—"খুব সম্প্রতি চেরাপুঞ্জী অঞ্চলে কয়েকটা নরবলি দেয়া হয়েছে। সর্পদেবতা ইউ-থালেনের কাছে নরবলি দেওয়া এই প্রথম নয়। গভর্ণমেণ্ট আপ্রাণ চেষ্টা করছে এসব বন্ধ করতে। নির্মূল করতে। এর মূলে অনবরত কুঠারাঘাত করে চলেছে। কিন্তু বুঝতেই পারছো অজ্ঞানতা আর কুসংস্কার মানুষের মজ্জায় লেপ্‌টে রয়েছে। এ প্রথা বহু পুরোনো। তবে মাঝে মাঝে আজো ঘটে। সম্প্রতি এরকম কয়েকটি ঘটনা ঘটে গেছে। তাই পুলিশ সতর্ক হয়েছে। পাশের অরণ্যে খুব সম্ভবত পুলিশ আসামীদের পিছু ধাওয়া করেছে। আর তাতেই বোধ করি এ গুলি-বিনিময়। বাসে ওঠার আগে এ অঞ্চলের পুলিশের আগমন-বার্তা আমি পেয়েছি।"

রোজ অনেক খোঁজ-খবর রাখে। ভারী স্মার্ট মেয়ে।

—"তার মানে, তুমি বল্‌তে চাইছো যারা নরবলি দেয় তাদের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে!" জিজ্ঞেস করেছিলো সুপ্রিয়।

—"থাকাই সম্ভব।" অতি সহজভাবেই উত্তর দিয়েছিলো রোজ, "তবে লাইসেন্স নেই নিশ্চয়। আচ্ছা, তুমি একটু বসো। আমি একটু ঘুরে সব কিছু দেখে ফিরছি।" রোজ টুক্ করে বাস থেকে নেমে পড়ে এবং তারপর দ্রুতপদক্ষেপে সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

লোকজন ব্যস্ত আর ত্রস্ত। ছুটোছুটি করছিলো সবাই। সবাইকার মুখে-চোখে ছিলো উৎকণ্ঠা। প্রশ্ন আর উত্তরের ঝড়-ঝাপ্‌টা চল্‌ছিলো। সুপ্রিয় বাসের সীটে বসে খবরের কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরে ছিলো সুপ্রিয়। বাসটা ছাড়ছে না কেন?

কখন শিলিং-এ পৌঁছুবে কে জানে! শিলং-এ পৌঁছে তাকে হোটেল খুঁজে বের করতে হবে।

কিন্তু কতোক্ষণ আর কাগজের পাতা সে উল্‌টিয়েছে! চারদিকের চীৎকার আর হট্টগোলে খবর হাত্‌ড়ানোর মিঠে আমেজটা কেটে গিয়েছিলো। কাগজের খবরের মধ্যে বুঁদ হয়ে পড়ে থেকে আশপাশ সম্বন্ধে উদাসীন হবার প্রচেষ্টায় বাধা পড়ছিলো। এর মধ্যে আরো কয়েকবার গুলির শব্দ ভেসে আসে।

কাছের ঝোপ্‌-ঝাড়ের দিকে ততোক্ষণে সবাই দৌড়ুচ্ছে। ব্যাপারটা কি? সবকিছু বুঝে ওঠার আগেই আবার গুলির শব্দ। পর পর দু'বার। গুলির শব্দ এবার খুব কাছে। আর বসে থাকা যায় না। বাধ্য হয়ে সুপ্রিয় বাস থেকে নেমে পড়ে। কারণটা জানতে হবে বৈকি! গুলির শব্দের উৎপত্তিস্থল লক্ষ্য করে লোকজনের সঙ্গে সুপ্রিয় এগিয়ে গিয়েছিলো।

নির্দিষ্টস্থানে পৌঁছে সবকিছু দেখে সুপ্রিয় পাথর বনে যায়। একি! এ যে এক অভাবনীয় ব্যাপার! এতো বড়ো একটা নাটকের জন্যে সুপ্রিয় মোটেই প্রস্তুত ছিলো না। নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করতে পারছিলো না। অসম্ভব! এ হতে পারে না। এ হওয়া উচিত ছিলো না। তার চোখের সামনে এ ঘটনা ঘটবার কোনো প্রয়োজন ছিলো না। সুপ্রিয়র অজান্তে, তার দৃষ্টির আড়ালে সব কিছু ঘটলে তার কিছু বল্‌বার ছিলো না। সুপ্রিয় দেখলো গুলিবিদ্ধ অবস্থায় রোজ পড়ে আছে। হ্যাঁ, মরে পড়ে আছে।

রোজ লিংডো। রোজ-এর জামা-কাপড়ের নীচে সোনার বার কোমরের সঙ্গে বাঁধা ছিলো। চোরাই সোনা। পুলিশ অনেকদিন ধরে নাকি তল্লাশী চালাচ্ছিলো। অপরাধীদের ধরবার জন্যে হিম্‌সিম্ খাচ্ছিলো। আজ অপরাধীদের সঙ্গে ঘন অরণ্যের ভেতর তাদের খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে। দলের নেত্রী হচ্ছে খাসি পরিবারের সর্ব-কনিষ্ঠা কন্যা রোজ লিংডো, তিন স্বামীকে যে ডাইভোর্স করেছে, চেরাপুঞ্জীতে

থাকাকালীন সর্প-দেবতার কাছে নরবলি দেবার ব্যাপারে সবাইকে যে উৎসাহ দিয়েছে, মদ্, আফিঙ্ আর সোনার চোরাই কারবারে যার জুড়ি ও অঞ্চলে মেলা ভার। এমন মেয়েরই সন্ধান করতে পুলিশ রোজ লিংডোর পিছু নিয়েছিলো। পুলিশ অনেকদিন ধরে নাকি তার সন্ধান করছিলো।

রোজ লিংডো একটা বিরাট গ্যাং-এর নেত্রীস্থানীয়া। কথায় কথায় সে নাকি পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়তো। নিজেই পুলিশের গুলি খেয়ে ভূমিশয্যা নিয়ে ততোক্ষণে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছিলো। অরণ্যের পথে লিংডো পালাচ্ছিলো। পুলিশের আহ্বান সে অগ্রাহ্য করেছিলো। জামার ভেতর থেকে রিভলবার বার করবার আগেই পুলিশ তাকে গুলি করেছিলো। রিভলবারটা তখনো পর্যন্ত ওর হাতের মুঠোয় ধরা ছিলো। রোজের রক্তাক্ত দেহটা মাটিতে পড়ে ছিলো।

মৃত্যু এসে ওর প্রাণ-চঞ্চল দেহটাকে হিমশীতল আর নীরব করে দিয়েছিলো। প্রাণ-চঞ্চল মেয়েটি আর কোনোদিন কথা বল্‌বে না। হাস্‌বে না।

পুলিশের সাব-ইন্‌স্‌পেক্‌টারের মুখে সুপ্রিয় সমস্ত কাহিনী শুনেছিলো। তারপর ভীড় জমে ওঠবার আগেই সে বাসে ফিরে এসেছিলো। তার চোখের কোণে ততোক্ষণে জল জমে উঠেছিলো। কেন ? কে জানে ?

সামান্য দু' এক ঘণ্টার ভেতর একটা মানুষ যে আরেকটা মানুষের মনকে এরকমভাবে জয় করে নিতে পারে তা সুপ্রিয়র জানা ছিলো না। রোজ বলেছিলো—"তুমি বোধ করি জানো না যে আমাকে একবার কাঁধে তুলবে,—আমাকে সে আর কাঁধ থেকে সহজে নামাতে চাইবে না।" কথাটা খানিকটা সত্য বৈকি! রোজের স্মৃতি সুপ্রিয়র অন্তঃকরণের অনেকখানি জুড়ে রয়েছে। তাকে দূর করা অসম্ভব। মহা দুষ্টু চঞ্চল মেয়ে। সে তিনটে স্বামীকে বিতাড়িত করেছিলো। খারাপ চরিত্রের মেয়ে তাতে আর সন্দেহ কি! কিন্তু তবুও কি যেন ওর মধ্যে ছিলো। সহজেই আকর্ষণ করে।

লেখাপড়া-জানা মেয়ে। খাসিদের সম্বন্ধে ও কতোকিছু জান্‌তো। ওর ইচ্ছে ছিলো কাম্বোডিয়া যাবে। মালয় উপদ্বীপে যাবে। খাসিদের আদি বাসভূমি দর্শন করে খাসিদের ঐতিহ্য সংস্কৃতি নিয়ে ইতিহাস লিখবে।

হলো না। কিছুই হলো না।

গুলিবিদ্ধ অবস্থায় রক্তস্নাত হয়ে রেজ লিংডো মাটিতে মুখ থুব্‌ড়িয়ে পড়ে রইলো। যে গেছে সে যাক্‌. ভাবে সুপ্রিয়।

পরমুহূর্তে সে চিন্তা করে—লাভ কি ওর কথা ভেবে! তবু বুকের মাঝখানে সেদিন একটা ব্যথা গুম্‌রিয়ে মরছিলো।

পথ চলতে চলতে সামনের দিকে তাকাতে হয়। পেছনের দিকে নয়!

এই ছ্যাখো, কোথায় বসে কোথাকার স্বপ্ন দেখছে সুপ্রিয়! সে মিনতিদির কথা ভাবতে সুরু করেছিলো।

শিলং-এর কথা ভাবতেই রোজ লিংডো এসে গেলো। মিনতিদি এতো কথার মাঝখানে টুক্‌ করে আত্মগোপন করলো। সুপ্রিয় স্রেফ মিনতিদির কথা ভুলে বসে রইলো।

এদিকে রাজগীরে কুণ্ডের আশেপাশে লোকের ভীড় বাড়ছে। নন্দা জল ছেড়ে ততোক্ষণে উঠে পড়েছে। উঠে এদিকেই আস্‌ছে। হয়তো সুপ্রিয়র কাছেই এসে বস্‌বে। তারপর সুরু হবে ওর বক-বকানি। গাত্রবাসের যা নমুনা! জল ঝরেছে ওর সর্বাঙ্গ থেকে। ঐ অবস্থায় সুপ্রিয়র সঙ্গে নন্দা কথা বল্‌বে। আর আশ্‌পাশের লোকগুলো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর রূপসুধা পান করবে। দৃষ্টি বুলিয়ে ওর সর্বাঙ্গ লেহন করবে। কি দরকার নন্দার সম্মুখীন হবার! কি দরকার এখানে আর থাকবার! চলে গেলেই হয়। নন্দা আসার আগেই তাকে পালাতে হবে।

সুপ্রিয় পা চালিয়ে দেয়।

॥ চ ॥

ফিল্ম সুটিং-এর কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সুটিং শেষ হতে আরো সপ্তাহ দু'এক-এর দরকার হবে। আজকের দিনটা সুপ্রিয়র বিশ্রামের দিন।

আলস্য-মধুর উজ্জ্বল প্রহর। হাট-বাজারের কোলাহল ছাড়িয়েছে সে অনেকক্ষণ। ছাড়িয়েছে মনোরম নয়নাভিরাম মেলা। হাড়-জিরজিরে দোকান-পাটের চৌহদ্দি পেরিয়ে সেই একঘেয়ে শহুরে জীবনের টানা-পোড়েন্ থেকে যেন বেঁচেছে। অরণ্যের পথ যেন তাকে হাতছানি দিচ্ছে।

শিমুল, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, বট, অশ্বত্থ, আম, জাম, জামরুল, কাঁঠাল, লিচু, শাল, সেগুন গাছের ঠেলাঠেলি, হুড়োহুড়ি। বেণুবন ছাড়িয়েছে সে অনেকক্ষণ। ঐ বেণুবন বাঁশবনে ঘেরা ছিলো একদিন। নিজের প্রমোদ-উদ্যান বেণুবনে মহারাজ বিম্বিসার স্থাপন করেছিলেন বুদ্ধ মহাবিহার। ভগবান বুদ্ধদেবের দুই প্রধান শিষ্য শারীপুত্র এবং মহা মোগল্লায়নের দেহত্যাগের পর বুদ্ধদেব বেণুবন বিহারের মধ্যেই তাঁদের নশ্বর দেহাবশেষের ওপর স্তূপ রচনা করেন।

জৈনধর্মের চতুর্বিংশতি এবং অন্তিম তীর্থঙ্কর ভগবান মহাবীর চতুর্দশ বর্ষা ঋতু রাজগৃহে কাটিয়েছিলেন।

সুপ্রিয় জঙ্গলের পথে এগিয়ে যাবার সময় দেখ্‌লো শ্মশানের চিতাগুলো জ্বল্‌ছে। ভুস্‌ভুস্ ধোঁয়া ছাড়ছে। কাছে-পিঠে কতো ঐতিহাসিক্ ইমারত ছড়ানো-ছিটানো রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কতো ঢিবির ধ্বংসাবশেষ। কতক ঘেরা রয়েছে। কতক ঘেরা হয়নি। রাজগীরের মাটির নীচে ঐতিহাসিক্ আরো কতো সম্পদ লুকোনো রয়েছে কে তার খবর রাখে। জনসাধারণের খুঁড়ে দেখা বারণ। সরকারের নিষেধ রয়েছে।

জঙ্গলে গাছের ভেতর দিয়ে রোদের ঝিলিমিলি। "পিচার প্ল্যান্ট্" মাংসাশী ফুলগাছ। মাটি থেকে প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন্ সংগ্রহ করতে কিছু গাছ পারে না। সুতরাং তাদের নির্ভর করতে হয় কীট-পতঙ্গ, পোকা-মাকড়ের ওপর। "ভেনাস্ ফ্লাই ট্রাপের" ফুলের দু'পাশে রয়েছে দুটি পাতা যা পোকা-ধরা ফাঁদ হিসেবে কাজ করে। পাতাগুলো ইঞ্চি চারেক লম্বা। এ পাতাগুলোর ভেতরের দিকে রয়েছে খুব ছোটো ছোটো কাঁটা। যখনই কোনো পোকা-মাকড় ওই কাঁটার ওপর এসে বসে তখন পাতাগুলো ভাঁজ হয়ে থাকে। এক সেকেণ্ডের কম সময়ের মধ্যে পাতা দুটো মুখ বন্ধ করে পোকাটাকে তার ভেতরে আটকে দেয়।

ছায়াঘন জঙ্গলে সারিবন্দী ক্যাক্টাস্। সোনালী চিল উজ্জ্বল আলোয় পাখা ঝাপ্টে ঝাপ্টে চলে যাচ্ছে। ডিচের গর্ত থেকে ভাট্ ফুল আর কাঁটা গাছের ঝোপ্ মাথা তুলেছে।

সারাদিনমান ছায়া সরে সরে খেলে বেড়ায় ওই পাহাড়ে। জঙ্গলের পথে ময়ূর তার হারেমের মহীয়সীদের কাছে পেখম তুলে নাচ্ছে। সপ্রশংস দৃষ্টি মেলে ধরেছে ময়ূরীরা। ডাক্ছে অদ্ভুত স্বরে। পাতাঝরা শিমুলেরা লালে লাল। আমের মঞ্জরী ঘিরে মৌমাছিরা আলাপ গুঞ্জনে মত্ত। আগুনের লেলিহান শিখার মতো অশোক, কিংশুক ও পলাশের বর্ণোচ্ছ্বাস। দু'পাশে খাড়া পাহাড়ের ঢালের মধ্যে মুলি গাছের জঙ্গল। আশেপাশে বিছুটির জঙ্গল। উৎরাই পথ নেমে এলো একটি ঝরণার তীরে। অগভীর শেওলার ভেতর শোলমাছ ঢুঁ মেরে কাদা ছিটোচ্ছে। চন্দ্রবোড়া থেকে থেকে মোচ্ড়ায়। সামনে মসীকৃষ্ণ জলরাশি। শান্ত গাঢ় পাহাড়ের প্রতিবিম্ব সে জলে।

একটি মধুমাখা বিকেল। ফণি-মনসার ঝোপ। গাছগুলো হুম্ড়ি খেয়ে পথের ওপর পড়েছে। অরণ্য গহন থেকে গহনতর। পাহাড়ের ওপর থেকে অরণ্য নেমে এসেছে উপত্যকার কোলে একটানা সবুজের স্রোতের মতো।

কতো ধরনের গাছ। শাল, পিয়াশাল, বোদ্, আমলকী, বহড়া, হরিতকী।

রাজগৃহ, প্রাচীন পরিত্যক্ত রাজধানী। ভারত ইতিহাসের এক গৌরবময় অধ্যায়। ভগ্ন প্রাচীর স্তূপের ভেতর প্যান্থার লেজ মোচ্ড়ায়। অলস মনটা বয়ে নিয়ে চলেছে সুপ্রিয়। ঝিরঝিরে হাওয়া। পাখীদের কলকাকলী। তারই ভেতর উদাস মনের মাতামাতি।

সামনেই মল্লভূমি। এখানে মল্লযুদ্ধে জরাসন্ধকে ভীম চিৎপাত করে ফেলে দু'পা ধরে টান দিয়ে দেহ দ্বিধা-বিভক্ত করেছিলেন। মহাভারতে বৃহদ্রথপুরের উল্লেখ রয়েছে। মহারাজ বৃহদ্রথ ছিলেন মহাপ্রতাপশালী মগধ নৃপতি, জরাসন্ধের পিতা। তাঁরই নামানুসারে এই নগরী এক সময় বৃহদ্রথপুর নাম পেয়েছিলো।

বৃহদ্রথের দুই ভার্যার গর্ভে কোনো সন্তান ছিলো না। উদারচেতা চণ্ড কৌশিক মুনি রাজাকে একটি আম্রফল দেন। সেই ফল দুই খণ্ড করে দুই রাজরাণী খেলেন এবং গর্ভবতী হয়ে দশম মাসে দু'জনে দুই শরীর-খণ্ড প্রসব করলেন। দু'জনেই সন্তান পরিত্যাগ করলেন। জরা নামে এক রাক্ষসী খণ্ডদুটিকে সংযুক্ত করলো। উৎপন্ন হলো এক পূর্ণাঙ্গ বীরপুরুষ। জরা রাক্ষসী কুমারকে যোজিত করেছিলো বলে তাঁর নাম হলো জরাসন্ধ।

যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে বসে যখন রাজসূয় যজ্ঞের বিষয় ভাবতে সুরু করেছেন, তখন কৃষ্ণ এই জরাসন্ধ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছিলেন। জরাসন্ধ ততোদিনে সকল নৃপতিকে পরাভূত করে শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। প্রতাপশালী শিশুপাল ছিলেন জরাসন্ধের সেনাপতি। মহাপ্রতাপশালী রাজারা ততোদিনে তাঁর সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করেছে।

বঙ্গ, পুণ্ড্র, কিরাতের পৌণ্ড্রক জরাসন্ধের পক্ষে যোগ দিয়েছে। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন—"মহারাজ জরাসন্ধ জীবিত থাকতে আপনি রাজসূয় যজ্ঞ করতে পারবেন না। তিনি ছিয়াশিজন

রাজাকে জয় করে রাজধানী গিরিব্রজে বন্দী করে রেখেছেন। আরো চৌদ্দজনকে পেলে সকলকে একসঙ্গে বলি দেবেন। যদি আপনি যজ্ঞ করতে চান, তবে সেই রাজাদের মুক্তি দেবার এবং জরাসন্ধকে বধ করবার চেষ্টা করুন।

যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছানুসারে কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন ব্রাহ্মণের বেশ ধরে তখন জরাসন্ধকে বধের জন্যে মগধ যাত্রা করলেন। তাঁরা এসে প্রবেশ করলেন মগধ দেশে।

এর পরে ঘটেছিলো অনেক ঘটনা। স্বাপ্রেয় পুঁথিপত্তর ঘেঁটে জেনেছিলো অনেক্কিছু।

অজাতশত্রু শেষপর্যন্ত শান্তির আশায় ব্রাহ্মণদের আশ্রয় ছেড়ে বুদ্ধদেবের চরণে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ভগবান বুদ্ধদেবের মহা নির্বাণ হবার পর তিনি রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধ মহাসম্মেলনের সমস্ত ব্যবস্থা পাকাপাকি করেছিলেন।

অজাতশত্রুর মানসিক পরিবর্তন সত্যি এক চমকপ্রদ ঘটনা।

খ্যাতনামা বৌদ্ধ মনীষীদের চেষ্টায় ও মহারাজ অজাতশত্রুর পৃষ্ঠ-পোষকতায় রাজগৃহে প্রথম বৌদ্ধ মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে রচিত হয় বৌদ্ধধর্মের মূল গ্রন্থ ত্রিপিটক্। কপিলাবস্তু বুদ্ধদেবের জন্মস্থান বলে গর্ব করতে পারে। বুদ্ধগয়া খ্যাতির দাবী করতে পারে বুদ্ধদেবের বুদ্ধত্ব লাভের। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে রাজগৃহের যে স্থান, তার বোধ করি তুলনা হয় না।

কৃষ্ণ, ভীম, অর্জুন গিরিব্রজ নগরের প্রান্তস্থ মনোরম চৈত্যক পর্বতে উপস্থিত হলেন। কৃষ্ণ, ভীম, অর্জুন ব্রাহ্মণের বেশ ধরে নগরের সমৃদ্ধি দেখতে দেখতে রাজমার্গ দিয়ে চললেন।

এক মালাকারের কাছ থেকে মালা আর অঙ্গরাগ কিনে নিলেন তাঁরা, বস্ত্র রঞ্জিত করলেন এবং মালা ধারণ করে অগুরু চন্দন চর্চিত হলেন।

সুপ্রিয় জরাসন্ধের রণভূমির কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। এখানে দেখবার কতো কিছু রয়েছে। মহাভারতের কালে এ নগরী

গিরিব্রজ নামে পরিচিত ছিলো। তখনকার সময়ের স্মৃতিচিহ্ন বহন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে মনিনাগ মন্দির অথবা মঠ। রয়েছে চক্র ঘর্ঘর-জনিত ক্ষতরেখা, জরা রাক্ষসীর বিচরণ ক্ষেত্র। জরাসন্ধের রণভূমি। আর রয়েছে প্রাচীন প্রস্তর-প্রাচীর আর বানগঙ্গা। বুদ্ধদেবের কালে এ নগরীর পরিচিতি ছিলো রাজগৃহ বলে। সে সময়ের স্মৃতিচিহ্ন বহন করে রয়েছে বেনুবন বিহার, গৃধ্রকূট, জীবকের আম্রবন, পিপ্পলী গুহা, মর্দকুক্ষি বিহার, দেবত্ত গুহা, বিম্বিসারের কারাগৃহ, অজাতশত্রু স্তূপ আর দূর্গ, সপ্তপর্ণি গুহা আর অশোক স্তূপ।

সমসাময়িক রাজগীরে রয়েছে বার্মিজ ও জাপানী বুদ্ধমন্দির। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর জৈনমন্দির। রামকৃষ্ণ মঠ। রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম। রত্নগিরি শীর্ষে জাপানী বুদ্ধসংঘের বিশ্বশান্তি স্তূপ। স্তূপে আরোহণের জন্যে বৈদ্যুতিক রজ্জুপথ।

এই মুহূর্তে জরাসন্ধের রণভূমির কাছে দাঁড়িয়ে সুপ্রিয় স্বপ্ন দেখছে। সে যেন ফিরে গেছে বহুযুগ আগে। স্মৃতির পলিমাটিতে ফাটল ধরেছে। এ জনপদ যেন সুপ্রিয়র অতি পরিচিত। স্মৃতির ওপর থেকে কালো পরদা এক এক করে খুলে পড়ছে। চিন্তা-গুলো মগজে এলোপাথাড়ি ঘুরপাক্ খাচ্ছে। সুপ্রিয় কি তবে এক সময় এ জনপদেরই বাসিন্দা ছিলো? না হলে স্মৃতি মন্থন করে এতো স্পষ্ট সবকিছু সে অবলোকন করছে কিভাবে? কি করে এ সম্ভব?

স্মৃতিপথে ভেসে আস্ছে বহু জন্মান্তর আগের সব ঘটনা। বিশশতকের পটভূমি থেকে এই মুহূর্তে সুপ্রিয়কে যেন কেউ উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। গুঞ্জন্ করতে করতে শতাব্দীগুলো এক এক করে পথ ছেড়ে দিচ্ছে। মহাকালের গুঞ্জন যেন কান পাতলে শোনা যায়।

জন্মান্তরের রহস্যাবৃত পথের অলিগলিতে সুপ্রিয় ঘুরপাক্ খাচ্ছে। পৌঁছে গেছে সে একটি পরিচিত যুগে। অন্য জীবনের ছায়াপাত যেন।

সে কি তবে ছিলো এক অনিন্দ্যসুন্দরী নারী? যৌবনের জোয়ার যার অঙ্গে অঙ্গে লহরী তুলে খেলা করে বেড়াতো?

মাল্য-চন্দন অঙ্গরাগে বিভূষিত এ তাপসতনয় কে? মালাকারের কাছে যে মালা ক্রয় করতে এসেছে সে বোধ করি এ নগরীতে অতিথি হয়ে এসেছে। তার রূপ-যৌবন দেখে পুর-নারীরা হয়েছে বিভ্রান্ত।

মালাকারের কন্যা লজ্জা-সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে পান করতে চায় অনিন্দ্যসুন্দর পুরুষের রূপসুধা। কে এই তাপসতনয়?

কি হেতু আগমন তার এ নগরীতে? কি তার পরিচয়? নগরীর পথে এ মুখদর্শন এই প্রথম।

আর তাপসতনয় তন্ময় হয়ে নারীর রূপলাবণ্য দেখছে। পান করছে যৌবন-সুধা। কন্যা পদ্মমুখে মেখেছে শ্বেতচন্দন। রক্ত গোলাপ গুঁজেছে কুন্তলে। রাজপথের আলোকজ্জ্বল বিপণিতে পসারী তার পণ্যসামগ্রী সাজিয়ে বসেছে। আগন্তুক ভাবছে কে এই মহীয়সী নারী? মালা বিক্রয় করবার আগে ব্রীড়াবনত লাস্যময়ী নারী ঘৃতদীপ তুলে দৃষ্টি ফেলে তরুণের রূপসুধা পান করছে। ধূপের সৌরভে সুরভিত বিপণি। কন্যার দেহ-লাবণ্য টল্‌টল্‌ করছে। তাপসতনয় ভাবছে সুবর্ণবর্ণা, গৌরাঙ্গী, চারুরূপিণী, সর্বাভরণভূষিতা, রূপ-যৌবনসম্পন্না কে এই নারী?

পরস্পর পরস্পরের রূপে মুগ্ধ। স্মৃতি আর স্মৃতি। শত জীবনের, শত ঘটনার ও অভিজ্ঞতার ইতিবৃত্ত। লহরী তুলে ভেসে চলে একটি প্রিয় নাম। স্নিগ্ধ আহ্বান-ধ্বনি। কতো যুগ পরে আজো করে চঞ্চল অধীর। রমণীর অন্তরে সেদিন সেকি অদ্ভুত দোলা! ধমনীতে উষ্ণ রক্তস্রোত! সে এক অপূর্ব মাদকতা। পরস্পরের মুখ-নিঃসৃত মাত্র কয়েকটি কথা। ভাষা নয়। এ যেন বীণার তারে উঠেছিলো সুরের ঝঙ্কার। মনের মন্দিরের ভিত্তিগাত্রে অদৃশ্য শিলালিপি রূপে লিখিত হয়ে থাকে। আজ অনেক অনেক যুগ পরে ঘ্রাণ, গন্ধ, দৃশ্যপট, ধ্বনি সমস্ত কিছু নিজ নিজ সত্ত্বা নিয়ে স্মৃতির আবরণ ছিঁড়ে ফেলে নিজেকে তুলে মেলে ধরেছে।

কুমারের নয়নে সেদিন ছিলো হরিণের ন্যায় চকিত চাহনি। দাঁড়াবার সেকি অনবদ্য ভঙ্গিমা! বড়ো বড়ো পিঙ্গল চোখ, পুরুষোচিত বীরত্বব্যঞ্জক চেহারা। বিশ্রামসুখের জন্য মালাকারের কতো অনুরোধ, উপরোধ! কুমারী মনের কতো আকুল প্রত্যাশা! কুমার আরক্ত বদনে, লজ্জানত শিরে সে অনুরোধ উপেক্ষা করেছিলো। স্নিগ্ধ আহ্বানের ধ্বনি সেদিন পারেনি তার গতিরোধ করতে। অর্জুন, কৃষ্ণ, ভীম সেদিন আত্মপরিচয় গোপন করেছিলেন। সময়ের অপব্যবহার করবার জন্যে কেউ তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না। কর্তব্যের রুক্ষ কঠিন পথ। প্রেম এসে রুদ্ধ দরজায় বার বার করাঘাত করে ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে গিয়েছিলো। সাড়া মেলেনি।

মল্ল-ক্রীড়াভূমিতে 'ওদের আবার দেখা হলো। মালাকার-দুহিতা আর পঞ্চ-পাণ্ডবদের ভেতর শ্রেষ্ঠ বীর পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জুন, পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হলেন। মল্লভূমিতে তখন মল্লক্রীড়া চলেছে। জরাসন্ধের সঙ্গে ভীম যুদ্ধে প্রবৃত হয়েছেন। জরাসন্ধ কিরীট খুলে ফেলে দৃঢ়ভাবে বেণীবন্ধন করে ভীমের সম্মুখীন হলেন। উৎসাহিত জনতার কোলাহলে প্রান্তর মুখরিত। যুদ্ধক্ষেত্রে নানা-প্রকার মাঙ্গল্য দ্রব্য, বেদনা এবং মূর্চ্ছা নিবারক ওষুধ থরে থরে সাজানো রয়েছে।

দুই যোদ্ধা বাহু ও চরণ দ্বারা পরস্পরকে বেষ্টন ও আঘাত করতে লাগলেন এবং ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হলেন।

তাঁরা হস্তীর ন্যায় গর্জন করে পরস্পরের কটি, স্কন্দ, পার্শ্ব ও অধোদেশে প্রহার করতে লাগলেন।

বহুসহস্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি স্ত্রী-পুরুষ যুদ্ধ দেখবার জন্যে সেখানে সমবেত হয়েছিলো। চারপাশের ভূমি ছিলো প্রস্তরাকীর্ণ, ঊষর, রৌদ্রদগ্ধ। মধ্যে মধ্যে অনুচ্চ পাহাড়। তার মধ্যে মৌচাকের মতো একাধিক গুহা।

গিরিগাত্র বেয়ে মাঝে মাঝে হাতীর দল নেমে আস্ছে। মনে হয় গিরিগাত্র বেয়ে যেন মেঘ গড়িয়ে পড়ছে। জলকেলি করার

আনন্দে শুঁড়ে করে পদ্মকেশর তুলে হস্তি হস্তিনীর গণ্ডে লেপন করছে।

মালাকার-দুহিতা চম্পক সদৃশ অঙুলি দিয়ে কুমারের গণ্ডোদেশে সোহাগ পরশ ছড়াচ্ছিলো। ওষ্ঠদেশ দিয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিলো কুমারের ওষ্ঠদেশ।

সমবেত নারী-পুরুষের ভেতর পুরুষেরা নিরাভরণ। তাঁদের আভরণশূন্য দেহ। অনেক স্ত্রী বক্ষাবরণশূন্যা। উন্মুক্তবক্ষা, উদ্ভিন্ন-যৌবনা নারীবৃন্দ দ্রাক্ষারস সেবনে হয়েছে আবেশে বিভোর। তাদের আকুতিতে ক্ষণে ক্ষণে সাড়া দিচ্ছে পুরুষেরা। উচ্ছলতা আর প্রাণ-প্রচুর্যে নারীদেহগুলো সরস, সতেজ। আকুলি-বিকুলিতে যেন কিসের আভাষ। বিহ্বল হচ্ছে পুরুষেরা। মল্লভূমি থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে প্রেয়সীর চাঁদমুখে। বাহুবেষ্টনে নিপীড়িত করছে তাকে। কোমল মাখনস্তূপে বুলোচ্ছে সোহাগ পরশ। উচ্ছলতার সঙ্গে প্রাণ-প্রাচুর্যের ঢল নেমেছে সারাটা প্রান্তরে। মনোহারিণী নারীদের সুরাপানে মত্ত আরক্ত নয়ন।

ক্ষণে ক্ষণে ঋক্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ উচ্চারিত হচ্ছে।

ওদিকে বরাহের মাংস, মৃগ, ময়ূর, কুক্কুট মাংসে পাত্রসকল পূর্ণ। রয়েছে বিভিন্ন ফলের ক্লাথরস। উৎকৃষ্ট অন্নব্যঞ্জন থরে থরে সাজানো রয়েছে। কতোদিন চলবে এ মল্লযুদ্ধ কে জানে!

মল্লযুদ্ধের চতুর্দশ দিবসে জরাসন্ধ ক্লান্ত। ভীম ওর দু'পা ধরে টান দিয়ে দেহ দ্বিধা-বিভক্ত করলেন। বিজয়ীরা স্বর্ণমুকুট মস্তকে চাপিয়ে বীরদর্পে চলে যান। প্রেয়সীর অশ্রুজল গতি স্তব্ধ করতে পারে না।

এক্ষণে জন্ম-জন্মান্তরের স্মৃতি মন্থন করে হতাশায় একটি হৃদয় ভরে ওঠে। মালাকার-দুহিতার হৃদয় সেদিন আকুলি-বিকুলিতে ভরে ওঠে। করুণ কান্নায় ভেঙে পড়ে পল্লবিত লতা। গণ্ডদেশ থেকে পলাশের আভা মুছে যায়। জেগে ওঠে হতাশায় পাণ্ডুর ম্লান

আভা। মালাকারের গৃহে জমে ওঠে নিরাশার কালো মেঘ। একটি নারীর হৃদয় হরণ করে বীরদর্পে বীরের দল চলে যায়।

সুপ্রিয়র এই মুহূর্তে ইতিহাসের ঘটনা থেকে মনটা চলে গেছে অন্যত্র। মহাভারতের ঘটনা স্মৃতি থেকে ক্রমশঃ বিস্মৃতি হতে চায়। রাজগৃহের সব কিছু ঝাপ্‌সা হয়ে আসে। জরাসন্ধের মৃত্যু-যন্ত্রণা চিন্তা করতে আর ইচ্ছে করে না। অর্জুনের আর মালাকার-দুহিতার প্রেম-উপাখ্যান কেমন ফিকে হয়ে আসে। জলোজলো ঠেকে। সুপ্রিয় দেখতে পায় ছিমছাম্ মেয়ে নন্দা বনপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এইমাত্র সে ঝোপটার পাশে বসে পড়লো। সে সুপ্রিয়কে দেখেছে আর দেখে হাসির মুক্তোবৃষ্টি করছে। চাউনি নয়, যেন একঝলক আগুন। সুপ্রিয়র হৃদ্‌পিণ্ডটাকে তাতিয়ে তুল্‌ছে।

চাউনিতে অনেক নেশা। সুপ্রিয়র মনের আনাচে-কানাচে একটা ভ্রমর গুন্‌গুন্ করে। ওর দীঘির কালোজলের মতো স্বচ্ছ গভীর কালো চোখ। দূরে আমলকী ডাল। তাতে ছোট ছোট চিকরি পাতা। ওধারে কালোমেঘের জঙ্গল। মেয়েটার তাজা দেহ। বুকে পাহাড়ের উত্তুঙ্গ স্পর্ধা। সুপ্রিয়র মনে কিসের যেন সুড়সুড়ি।

সুপ্রিয় এসে বসেছিলো নন্দার পাশে। নন্দা মাটিতে শুয়ে মিটিমিটি হাস্‌ছিলো। তার মাথার নীচে দুই হাত। সুপ্রিয় তার লোভী হাতটা নন্দার মাথায় রেখেছিলো। নন্দা হাস্‌ছিলো। হাস্‌ছিলো আর হাস্‌ছিলো। সুপ্রিয়র পক্ষে এক প্রবল আকর্ষণ ওই নন্দা। এ দু'সপ্তাহের ভেতর মেয়েটা মনটাকে এরকম-ভাবে জয় করলো কি করে? সুপ্রিয়র এ মেয়েটার ওপর অকারণ এ লোভ কেন? প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পায় না সুপ্রিয়। এই মুহূর্তে নন্দার এক হাত সুপ্রিয়ের হাতে ধরা রয়েছে। পরস্পরের ঘনঘন দৃষ্টি-বিনিময় হচ্ছে।

—"বাবু তুই মরেছিস্।" বলে নন্দা।

—"আমি মরতে চাই।" উত্তর দেয় সুপ্রিয়।

—"কিন্তু আমি তোকে মরতে দেবো না।"

—"কেন ?" চমকায় সুপ্রিয়।

—"না, না। তুই বড়ো ঘরের ছেলে। আমি ছোটো ঘরের ছোট জাতের মেয়ে। আমার সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করা তোর সাজে না। আমি উচ্ছিষ্ট। তোর কতো নাম। কতো যশ। আমি তোর সম্বন্ধে সব খোঁজ-খবর নিয়েছি। শুনেছি কলকাতায় তোর নাম করলে লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে চিনে ফেলে। সবাই নাকি তোকে চেনে। এখানে আমি লুকিয়ে লুকিয়ে তোর ছবি তোলা দেখেছি।"

সুপ্রিয় বলে—"তাই নাকি ?"

—"হ্যাঁ, তুই টের পাস্‌নি। তোর কি সুন্দর কথা বলার ঢং! আমি শুনে অবাক্। মুখে রং মেখে যখন তুই কথা বল্‌ছিলি বাবু তখন তোকে কি সুন্দরটাই না লাগ্‌ছিলো! না, না বাবু। অধর্ম করিস্‌নে।"

সুপ্রিয় নন্দার গালে হাত বোলাচ্ছিলো। উত্তুঙ্গ পাহাড় দুটো তাকে বার বার যেন হাতছানি দিচ্ছিলো। লোভ হচ্ছিলো কতো। দুটি ঠোঁটের সে কি অপূর্ব মাদকতা! নিবিড় বেষ্টনে ওর দেহটাকে পিষ্ট করবার আকুল বাসনায় সুপ্রিয় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলো।

—"কিন্তু আমি যদি তোকে চাই ?"

আকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করে সুপ্রিয়।

নন্দার দেহে রোমাঞ্চ। চোখ দুটো আবেশের ছোঁয়া পেয়ে স্বপ্ন দেখতে সুরু করেছে। হাতটা কাঁপছিলো ঘনঘন। যখনই নন্দার গালে সুপ্রিয় নিজের গাল বোলাচ্ছিলো, তখুনি নন্দার হৃদয়ে তৃষ্ণার আগুনটা জ্বল্‌ছিলো ধক্ ধক্ করে।

—"না, তুই চাইলেও আমি রাজী হবো না। তোকে আমি নষ্ট হতে দিতে পারিনে। তুই বড় ঘরের ছেলে। তোর অনেক আশা। অনেক ভরসা। নাম-যশ হবে তোর অনেক অনেক। তাছাড়া তোর বিয়ে হবে। টুক্‌টুকে বউ আস্‌বে। তোর বউ এসে সব জানতে পারলে আমাকে অভিসম্পাত দেবে। তুই ঘর-সংসার করবি। তোর ঘরে রাঙা খোকা-খুকু আস্‌বে। আমি নষ্ট

মেয়ে রে। তোকে আমার ভালো লেগেছে। নষ্ট মেয়ের তোর মতো ভালো ঘরের ছেলেকে ভালো লাগ্‌তে নেই। তোকে আমি নষ্ট হতে দেবো না। আমার জীবন-ভরা রয়েছে শুধু পাপ আর পাপ।”

—“তাই নাকি ?” বলে সুপ্রিয়।

—“হ্যাঁ, দেহটা পাপে বোঝাই। নর্দমাও বলতে পারিস্‌। কুণ্ডের জলে ডুবোডুবি করেও এ পাপ সাফ করতে পারিনে। তুই ভুলিস্‌ না। একটা নষ্ট মেয়েছেলে দেখে তুই দুর্বল হোস্‌ না। বাবু, আমি তোর ভোগের জন্যে নই। তোর জন্যে আস্‌বে টুক্‌টুকে রাঙা বউ।”

সুপ্রিয় নিষেধ শোনেনি। নিজের ঠোট দুটো নন্দার ঠোঁটের ওপর জোর করে চেপে ধরেছে।

হাত বাড়িয়েছিলো উত্তুঙ্গ পাহাড়ের দিকে। নন্দা এক ঝট্‌কায় হাত সরিয়ে ওকে মাটিতে ঠেলে ফেলে উঠে দাঁড়ায়। তারপর ছুটে পালায়। যাবার সময় বার বার পেছন দিকে ফিরে ফিরে তাকায়। ওর দু’চোখে দু’ফোঁটা জল টল্‌টল্‌ করে।

সুপ্রিয় কেমন অভিভূত। বিস্মিত। নিজের দুর্বলতার জন্যে সে যেন একটু বিমর্ষ। লজ্জিত তো বটেই।

ছোট ঘরের মেয়ে, এতো সহজে লোভ জয় করলো কি করে ?

॥ ছ ॥

রেস্ট্ হাউসের বারো নম্বর ঘরে বসে সুপ্রিয় ভাবছিলো মিনতিদির কথা। শিলং-এ শেষবার যখন সুপ্রিয় গিয়েছে তখন শিলং-এর চেহারা অনেক পাল্টে গেছে। নতুন শিলং-এর সঙ্গে পুরোনো শিলং-এর সেদিন অনেক প্রভেদ। শিলং-এর মোটর কোম্পানীর ততোদিনে অনেক উন্নতি হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি হয়েছে মোটর গাড়ি আর বাসগুলোর। কোম্পানীর আমলের মরচে-পড়া, রং-ওঠা, লাল গাড়িগুলো আর নেই। সে সময় স্টেট্ ট্রান্স্পোর্ট জন্ম নিয়েছে। স্টেট্ ট্রান্স্পোর্টের গাড়িগুলোর চেহারা অনেক ভালো।

টিকিটঘরগুলোর চেহারা পাল্টিয়েছে। আগেকার সেই পায়রার খোপের মতো ঘর আর নেই। মোটর থেকে নেমেই সুপ্রিয় বিনোদ-বাবুর খোঁজ নিয়েছিলো। পুরোনো আমলে বিনোদবাবু টিকিট দিতো। না, বিনোদবাবু নেই। রিটায়ার করে চন্দননগর না বন্-হুগলী, কোথায় যেন চলে গেছে। স্টেট্ ট্রান্স্পোর্টের অফিসঘরের নিয়মকানুনের মধ্যে, ফাইলপত্রের ভীড়ের মধ্যে, নিয়ম-শৃঙ্খলার নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে বিনোদবাবু নিশ্চয়ই হাঁসফাঁস করতে রাজী হতো না।

কড়া শাসনের ভেতর তার টেঁকা দায় হতো। বিনোদবাবুর কথা সুপ্রিয়র স্পষ্ট মনে আছে। বিনোদবাবুর বয়স ছিলো পঞ্চাশের ওপর। অবিবাহিত ছিলো বিনোদবাবু। তার মাথায় ছিলো প্রকাণ্ড একটা টাক। তাতে সে তেল ঘষ্তো প্রচুর। সর্বক্ষণ চক্চকে চেহারাটি বজায় রেখে টাকটি যেন মাথাটি আগলিয়ে থাক্তো। সুপ্রিয়র অনেক সময় মনে হয়েছে বিনোদবাবুর মাথার বিরাট টাকটা স্বচ্ছন্দে আয়নার কাজ চালিয়ে দিতে পারে। এমনকি সুর্যের রশ্মি ওতে

প্রতিফলিত হয়ে অনায়াসে কাগজ পুড়িয়ে দিতে পারে। টিকিট-ঘরের গর্ত দিয়ে টিকিটের জন্যে হাত বাড়ালেই বিনোদবাবু হাতের চেটোটা টেনে ধরতো। আর সঙ্গে সঙ্গে নজর করে হাতের রেখা গুন্‌তে স্থুরু করতো। যার হাতের রেখা বিনোদবাবু খুঁটিয়ে-নাটিয়ে দেখ্‌তো, তাকে হয়তো বিনোদবাবু মোটেও চিন্‌তো না। এমনকি তার সাতকুলের কাউকেই হয়তো চিনতে না। হাত দেখে জ্যোতিষশাস্ত্র আওড়াতো বিনোদবাবু। যার করতলের রেখার ওপর বিনোদবাবু চোখ বোলাতো সে হয়তো হা করে টিকিট কাউণ্টারের বাইরে তীর্থের কাকের মতো টিকিটের জন্যে দাঁড়িয়ে থাক্‌তো। বিনোদবাবু শাস্ত্র আওড়িয়ে চল্‌তো। তার হিসেব মতে কারো তখন চলেছে বৃহস্পতির জ্বলন দশা। কারুর বা বুধের। অমুক গ্রহ হয়তো বক্রী। অমুক তুঙ্গী। আড়াইমাস পরে সৌভাগ্য বৃদ্ধি। তাবিজ কবজ ধারণ করলে হয়তো বদগ্রহের হাত থেকে হবে মুক্তিলাভ। গ্রহের যে সমস্ত অশুভ যোগাযোগ গুটিগুটি এগিয়ে আস্‌বার সম্ভবনা ছিলো, বিনোদবাবুর মতে তাদের পথ রোধ করবার জন্যে শান্তি কবচ ধারণ করা ছিলো অবশ্য করণীয়।

পুত্রসন্তান লাভ, বিবাহ, মোকদ্দমায় জয়লাভ ইত্যাদি নানাদিকে সাফল্য অর্জনের সমস্ত গুপ্তমন্ত্র বিনোদবাবু পকেটে পুরে সেল্‌স্‌ কাউণ্টারে টিকিট বিক্রি করতো।

বিনোদবাবু বলতো—"ঘাবড়াবেন না মশাই। গাড়ি আমার হুকুমে ছাড়্‌বে। টিকিট বিক্রী সমাপ্ত হলে তবেই গাড়ি ছাড়্‌বে। শেড্যুল্‌ টাইম নট্‌ স্ট্রীক্‌লি ফলোড্‌। গাড়ি আমার হুকুমে নড়্‌বে। আর গ্রহ-উপগ্রহ কথা শুনবে তাবিজ-কবজের।"

জ্যোতিষী বিদ্যা জাহির করবার পর ভদ্রলোকটিকে হাতের ইশারায় বিনোদবাবু ঘরের ভেতর ডাক্‌তো। কিছু সেলামী দেবার পরেই ভদ্রলোকটির মুক্তি মিল্‌তো। টিকিটের সঙ্গে এ যেন রিজার্ভেসন্‌ ফি। না দিয়ে পালাবার উপায় নেই। বিনোদবাবু আর

কতো মাইনে পেতো। অবসর সময়ে জ্যোতিষী বিদ্যার ওপর ভরসা করেই ওর সংসার চল্‌তো।

বাসের টিকিটের বন্দোবস্ত করতে করতে একফাঁকে ভদ্রলোকটির বাসস্থানের ঠিকানা বিনোদবাবু জেনে নিতো। যোগাযোগ রাখ্‌বার প্রচেষ্টা। সুপ্রিয় ততোক্ষণে তাকিয়ে তাকিয়ে স্টেশনটা দেখতে সুরু করেছে। পুরোনো মোটর স্টেশনের অনেক উন্নতি হয়েছে। গাড়ির সংখ্যা বেড়েছে। লোকজনের সংখ্যাও অনেক বেড়েছে। ছুটোছুটি হৈ-হুল্লোড়ের কমতি নেই।

পুরোনো দিনের ঝিমোনো, নেতিয়ে পড়া ছোট্ট স্টেশনটি যেন ঘুম থেকে সদ্য জেগে উঠেছে। জেগে উঠেই বড্ডো কর্মব্যস্ত। চারদিকে সাড়া তুলেছে। রাতারাতি যেন প্রকাণ্ড বড়ো হয়ে গেছে। মোটর স্টেশন থেকে বেরিয়ে আস্‌তেই চোখে পড়ে দূরে ট্যাক্সিস্ট্যাণ্ড। সিনেমা হলটাও চোখে পড়ে। সম্প্রতি দোতলা হয়েছে। পুলিশ বাজারে দোকানের ছড়াছড়ি। মোটর স্টেশনের কাছেই সিভিল হস্‌পিটাল। সেখানে ভীড় বেড়েছে। তার অর্থ শিলং-এ রোগী, রোগিণীর সংখ্যা বেড়েছে। পুরোনো দিনে অসুখ-বিসুখের বালাই ছিলো না। সুপ্রিয় যখন প্রথমবার শিলং-এ এসেছিলো হাসপাতালের করিডর তখন একেবারে ফাঁকা। লোকজন শূন্য। লোকে শিলং যেতো স্বাস্থ্য ফেরাতে। গালে আপেলের আর টমাটোর রংটি ফুটিয়ে তুলে ফিরতো। মাছি মশার উপদ্রব একেবারে ছিলো না। খাসি আর জয়ন্তিয়া ছেলেমেয়েদের কি চমৎকার স্বাস্থ্যই না ছিলো। মেয়েদের গালে সদাসর্বদা রক্তিম আভা। গ্রীষ্মের দিনে ছেলেদের পায়ে থাক্‌তো গরম মোজা। গায়ে উলের সোয়েটার।

খাসি যুবক আর বৃদ্ধদের মুখে পাইপ। বাঁশ কেটে নিজেরাই পাইপ বানিয়েছে। পুলিশ বাজারের মাঝখানে পৌঁছে সেই পুরোনো রেঁস্তোরাটার জন্যে এদিক্‌-ওদিক্‌ তাকায় সুপ্রিয়। রেঁস্তোরাটা নজরে এসে যায়। সাধনদার সেই এতোটুকুন্‌

রেঁস্তোরা আজ ফুলে-ফেঁপে একাকার। সেদিনকার জীর্ণ রেঁস্তোরার সঙ্গে আজকের শ্রী আর জৌলুস্ ছড়ানো রেঁস্তোরার কতো প্রভেদ। সেদিনকার রেঁস্তোরা ছিলো ভাঙা। তার সব কিছু ছিলো নড়্‌বড়ে। কেঁদে-ককিয়ে কোনোমতে যেনো রেঁস্তোরাটা দাঁড়িয়ে ছিলো। ছিলো শ্রীহীন আর বিশ্রী। আজ সেই পুরোনো রেঁস্তোরার শ্রী ফিরে এসেছে। গায়ে-গতরে সে বেশ হৃষ্টপুষ্ট। নধরকান্তি চেহারা। সারাটা অঞ্চলে জৌলুস্ ছড়িয়ে গম্‌গম্ করছে।

পুরোনো রেঁস্তোরায় ছিলো গুটি-কয়েক পায়রার খুপ্‌রির মতো ঘর। শেওলা শোভিত একফালি উঠোন। ঘরগুলোতে সম্বল ছিলো গুটি-কয়েক ভাঙা টেবিল আর চেয়ার।

ছোট্ট আলো-বাতাসহীন ঘরের ভেতর বসে সাধনদা আর সুপ্রিয় কতো সন্ধ্যাবেলা আর কতো প্রভাতে কতোই না আলাপ-আলোচনায় মেতেছে। ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছবি এঁকেছে। বার্নিশ উঠে-যাওয়া বিবর্ণ আলমারীগুলো, একখানি কাঁচও যার অক্ষত ছিলো না, তারই ভেতর চপ্-কাট্‌লেটের পাশাপাশি সন্দেশ আর রসগোল্লা রাখার বন্দোবস্ত ছিলো।

হাফ কাপ চা-এর অর্ডার হতো ঘনঘন। স্কুল-কলেজের ছেলে-ছোক্‌রাদের সুখ-সুবিধের দিকে সাধনদার পুরো নজর ছিলো। ছাত্রদের সুবিধের জন্যে সাধনদা চা-এর রেট্ মানে প্রতি কাপ চা-এর দাম অনেক কমিয়ে এনেছিলো। চপ্ আর কাট্‌লেট্ বানানোর ভার মাঝে মাঝেই সাধনদার কাঁধে এসে পড়তো, কারণ পয়সার অভাবে মাঝে মাঝেই কারিগর বহাল করবার সঙ্গতি সাধনদার থাক্‌তো না। চপ্ ভাজতে ভাজতে অনেক সময় হেঁসেল্ থেকে উঠে এসে সাধনদাকে চা আর মিষ্টি, চপ্ আর পরোটা, খরিদ্দারদের অর্ডার মতো তাদের হাতের কাছে যোগাতে হতো।

অসমতল, সারা শরীরে দগ্‌দগে ঘা, ক্ষত-বিক্ষত, কাদা-জল বোঝাই উঠোনটার পাশে বসে কত সন্ধ্যে সুপ্রিয় আর সাধনদা বাসন মেজেছে।

সুপ্রিয় রাস্তার কল থেকে জল তুলে এনেছে। সাধনদা কয়লা ভেঙেছে। একদৃষ্টে সেই পুরোনো রেঁস্তোরাটাকে দেখ্‌ছিলো সুপ্রিয়।

আজ এ রেঁস্তোরার বাহার কতো! নিওন লাইট, বয়-বেয়ারা আর বাবুর্চি। পুরোনো দিনের সমস্ত চিহ্ন নিশ্চিহ্ন হয়ে গছে। কোথায় হারিয়ে গেছে সাধনদা আর সুপ্রিয়। মিলিয়ে গেছে তাদের সম্মিলিত স্বপ্ন। আশা-আকাঙ্ক্ষা ভেঙে ্রমার হয়েছে। ভাঙা জানালা, ছেঁড়া পরদা, নড়্‌বড়ে, পা ভাঙা টেবিল চেয়ারের অদৃশ্য হবার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেছে সমস্ত কিছু। জানালায় পরদার অভাবে মিনতিদির শাড়ি একদিন ছিঁড়তে হয়েছে। সুপ্রিয় দেখতে পেলো জানালায় আজ সিল্কের দামী পরদা ঝুল্‌ছে। শাড়ির ছেঁড়া টুক্‌রো হারিয়ে গেছে। তার সঙ্গে হারিয়ে গেছে মিনতিদির স্নেহের পরশ। সেদিনকার তেল-জলবিহীন রুক্ষ চুল, অযত্নে বেড়ে ওঠা ছেঁড়া ফ্রক পরা বালিকাটি আজ যেন সযত্নে চুল আঁচড়িয়ে, দামী শাড়ি-ব্লাউজে শোভিত হয়ে, চোখ ঠারছে

মনে পড়ে সেই দুরন্ত শীতের সন্ধ্যা। বাইরে ফ্রস্ট্‌ পড়্‌ছে। ভেতরে কন্‌কনে ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে যায়। সাধনদা দু'হাতে দুটো ভারী বস্তা টান্‌তে টান্‌তে ঘরে প্রবেশ করলো। একটাতে কয়লা বোঝাই। আরেকটাতে বাজারের সওদা। সাধনদার চুলে তখনই পাক ধরেছে। মুখভর্তি ছিলো একরাশ খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তার গায়ে থাকতো সোয়েটার। তার জায়গায় জায়গায় পোকায় কেটেছে। সাধনদার পায়ে অনেক সময়ই মোজা থাক্‌তো না। থাক্‌লেও ছেঁড়া। পায়ের আঙুলগুলো মোজার ফাটল্‌ দিয়ে হয়তো বেরিয়ে থাক্‌তো। ঠাণ্ডায় হাত-পায়ের আঙুল ফেটে রক্ত ঝরতো। সুপ্রিয়কে একদিন রুটি সেঁক্‌তে দেখে সাধনদা বলেছিলো,

—"তোর প্রতিদিন সন্ধ্যেবেলা জ্বর হচ্ছে। তবে কেন স্যাঁতসেতে অন্ধকার ঘরে রুটি সেঁক্‌তে বসেছিস্‌? তোর আজ দোকানে আসাই উচিত হয়নি। আমিই রুটি সেঁকে নিচ্ছি।"

—"না, আমার কিছুই হয়নি।" তীব্র প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিলো সুপ্রিয়।

—"না, কিছুই হয়নি! আমি বাইরে বেরুবার সময় কপালে হাত দিয়ে দেখ্‌লাম তোর গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। না, না। তোর কিছুই করতে হবে না। দোকানে খরিদ্দারের ভীড় কমে গেলে বাসন্-টাসন্‌গুলো বরং আমিই সাফ করবো। পই-পই করে বললাম সাত-সকালে তোর জল ঘাঁটাঘাঁটির দরকার নেই, তা ছেলের কথা শোনা হলো না! তোর সাধনদা যতোদিন বেঁচে আছে ততোদিন তোর বৌদির আর তোর কিছুই ভাবতে হবে না। এবার এক দৌড়ে তোর বৌদির কাছে চলে যা দিকিন্। গরম এককাপ দুধ গিলে লক্ষ্মী ছেলের মতো সোজা চলে যাবি লেপের তলায়। আমি খানিকক্ষণ পরে এসে তোর হাতে-পায়ে গরম তেল মালিশ করে দেবো। যা, চলে যা। আত্মীয়-স্বজন বলতে তোর কেউ নেই এখানে। আমার কাছে যখন রয়েছিস্ তখন সব কিছু দেখাশুনো করার ভার আমার ওপর। সব কিছু আমারই করতে হবে বৈকি। ভালমন্দ একটা কিছু ঘটে গেলে কি হবে বল্ দিকিন্!"

সাধনদা কয়লা ভাঙতে থাকে আর আপন মনে সবকিছু বলে যেতে থাকে। চপ্-পরোটা ভাজবার লোকটা সেদিন অনুপস্থিত। সে কাজটাও সাধনদাকে সারতে হবে।

—"তোমাকে একরাশ কাজের ভেতর গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে রেখে আমি কি করে লেপের তলায় যাবো? মন সায় দিচ্ছে না।" বলে সুপ্রিয়।

—"আরে পাগলা ছেলে, তোকে কিছু ভাবতে হবে না। আমি সবকিছু ম্যানেজ করতে পারবো।"

সাধনদার কথাগুলো এতদিন পরে আজও সুপ্রিয়র কানে বাজছে। সুপ্রিয় ঝক্‌মকে রেঁস্তোরাটার আপাদমস্তকে দৃষ্টি বোলাচ্ছে। আজ রেঁস্তোরার বরাত খুলে গেছে। ফুলে-ফেঁপে একাকার। আজকের মালিক পয়সাওয়ালা লোক। আজ এখানে দারিদ্র্যের এতটুকুন্ চিহ্ন

নেই। অন্ধকার একটা ঘরে মুখোমুখি বসে কতোদিন সুপ্রিয় আর সাধনদা টাকার হিসেব-নিকেশ করেছে। সমস্যার যেন সমাধান হতে চাইতো না। হয়তো দু'মাসের ঘর ভাড়া বাকি পড়েছে। দোকানের লোক মাইনের জন্যে গোঙাচ্ছে। কাতরাচ্ছে। করুণ আবেদন-নিবেদন জানাচ্ছে।

এমন অনেকদিন গেছে যখন গভীর রাত পর্যন্ত সাধনদা আর সুপ্রিয় কপালে হাতের আঙুল বুলোতে বুলোতে টাকার হিসেব-নিকেশের ভেতর ডুবে রয়েছে। দারিদ্র্যের অসংখ্য ফুটো বন্ধ করবার জন্যে প্রয়াসী হয়েছে।

যতোই প্ল্যান্ এঁটেছে সবকিছু যেন বন্যার তোড়ে ভেসে গেছে। মাথা উঁচু করে দারিদ্র্যের চুড়োটুকু শুধু জেগে রয়েছে।

সুপ্রিয় যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে শেওলা পড়া উঠোনটার ওপর উপুড় হয়ে বসে শীতের সন্ধ্যায় সাধনদা চায়ের কাপ-প্লেটগুলো জল দিয়ে পরিষ্কার করছে। বারে বারে গিয়ে সড়ক থেকে বালতি বালতি জল তুলে নিয়ে আস্ছে। রেঁস্তোরার পেছনের দরজাটা সেদিন ভাঙা ছিলো। তাই দিয়ে ঘরে ঢুক্তো হাড়-কাঁপানো শীতের হাওয়া।

আজকে কোন্ এক অদৃশ্য শক্তির টানে সুপ্রিয় এক পা এক পা করে রেঁস্তোরার দিকে এগিয়ে যায়। একতলা রেঁস্তোরা আজ দোতলা হয়েছে। ভালো জামা-কাপড় গায়ে চড়িয়ে তরুণ-তরুণীর দল সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করছে। রেডিওতে হিন্দী গান বাজছে। ঘরে ঘরে জানালা-দরজায় সিল্কের পরদা উড়ছে। সোডার বোতলের ছিপি খোলার ঘনঘন শব্দ। গ্লাসের টুং-টাং। এখন এখানে ড্রিঙ্ক্‌সের বন্দোবস্ত রয়েছে। আজকাল ছেলেদের হাতে সন্দেশ তুলে দিলে তারা খুশি হয় না। রাম্, জিন্, হুইস্কী। ভাবতেই পারে না সুপ্রিয়।

সাধনদা তার জীবন-কাহিনীর খানিকটা সুপ্রিয়কে শুনিয়েছিলো। শুনিয়েছিলো প্রথম:বউ কিভাবে অন্যের হাত ধরে এক রাত্রে বেরিয়ে গিয়েছিলো। সুপ্রিয় শুনেছিলো এক কলঙ্কময় দুঃখের কাহিনী।

মিনতিদি আর সাধনদার বাস্ ছিলো একই গ্রামে। একরাতে ডাকাতদের আক্রমণে মিনতিদির বাপ, মা, ভাইবোন সব মরেছিলো। রাতের অন্ধকারে আমবাগানের মধ্য দিয়ে পাগলের মতো ছুটে মিনতিদি বেঁচেছিলো। আশ্রয় নিয়েছিলো সাধনদার কাছে। এর পর বরাবর সাধনদার সঙ্গেই মিনতিদি রয়েছে। অনেক ঘাটে ওরা ওদের নৌকো ভিড়িয়েছিলো। ওরা দারিদ্র্যের সঙ্গে আপ্রাণ যুদ্ধ করেছে। সাধনদার সঙ্গে মিনতিদির বয়সের অনেকটা পার্থক্য ছিলো।

যেদিন পুরোনো রেঁস্তোরার বেচাকেনা ভালো হতো, সাধনদার মনমেজাজ যেদিন ভালো থাক্‌তো, মনে যেদিন খুশি খুশি ভাব সেদিন রাতের বেলা দোকানে খরিদ্দারের আনাগোনা থেমে গেলে সাধনদা সমস্ত কিছু গুছিয়ে নিয়ে টেবিলের ওপর জাঁকিয়ে বস্‌তো। চেয়ারে বস্‌তো সুপ্রিয়।

সাধনদা পকেট থেকে বের করতো ছোট্ট মদের বোতল। গ্লাসে মদ ঢেলে একটু একটু করে চুমুক দিতো। দিলের দরজা সেদিন খুলে ধরতো সাধনদা। তারপর কতো গল্প, কতো কথা। কল্পনার ফানুস ওড়াতো। আশার রঙীন জাল বুন্‌তো। তখন সাধনদা যেন অন্য মানুষ। গল্প বল্‌তো সাধনদা। প্রথম বউ-এর গল্প। মিনতিদির গল্প। খুশির সরোবরে ডুবোডুবি করতো সাধনদা। সুপ্রিয় সবকিছু চুপ করে শুন্‌তো, শুন্‌তো আর শুন্‌তো।

আজকে এ রেঁস্তোরায় ঢুকে সবকিছু নূতন করে সুপ্রিয়র মনে পড়েছে। এখানে আজ আর সুপ্রিয়র কোনো প্রয়োজন নেই। একটি শিশুকে তারা অন্যের হাতে তুলে দিয়েছিলো।

শিশুকন্যা আজ ভরা যৌবন নিয়ে পুরোপুরি যুবতী। চিন্‌তেই পারছে না সুপ্রিয়কে। তাকে আজ আর চেন্‌বার প্রয়োজনটাই বা কোথায়!

বয় মেনু হাতে দৌড়ুচ্ছে।

মাংস, চপ্, কাট্‌লেট্, কেক্, পোলাও, কালিয়া—খাবারের বিপুল আয়োজন।

কতো কিছু মেনুতে লেখা রয়েছে।

বয়কে ডাকে সুপ্রিয়। ডেকে কফির অর্ডার দেয়।

স্কার্ট পরিহিতা, লিপ্‌স্টিক্‌ আর প্রচুর রুজ মেখে, প্রসাধনের বাড়াবাড়ি ঘটিয়ে কয়েকটি মেয়ে অকারণে সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করছে। তারা যেন বেশিরকম চঞ্চল্। বিভ্রান্তকারী দৃষ্টি ওদের চোখে। ওরা হাসি ছড়িয়ে ঘুর্ণীর হাওয়ায় যেন উড়ছে।

ওরা দেহের আনাচে-কানাচে নিমন্ত্রণ-লিপি এঁটে, লজ্জা-সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নিজেদের জাহির করছে বড্ডো বেশি। পীনোন্নত পয়োধরা রমণীরা কামনার পিল্‌সুজে তেল ঢেলে সল্‌তে সাজিয়ে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের জন্যে যেন অপেক্ষা করছে। সেই আগুনে কামনা বাসনা ধীরে ধীরে পুড়বে, গলবে, ঝরবে।

পুরোনো রেঁস্তোরার সেই নোংরা এবড়ো-খেবড়ো উঠোন সিমেণ্ট ঢেলে ভরাট করা হয়েছে। ফুলের টব এনে তার শোভা বর্ধন করা হয়েছে। সুপ্রিয় রেঁস্তোরার দোতলার ঘর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে সব দেখছে। সে যেন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলো হাঁটুর ওপর বস্ত্রখণ্ড তুলে সাধনদা উপুড় হয়ে বসে কয়লা ভাঙছে। রেঁস্তোরাকে বাঁচাতে হবে। ছোট এক চারাগাছের গোড়ায় অনবরত জল ঢেলে চলেছে সাধনদা। ওকে বিরাট মহীরুহতে পরিণত করতে হবে। কতো আশা, কতো আকাঙ্ক্ষা!

—"তুই একদিন দেখবি সুপ্রিয়, আজকের এই ছোট্ট রেঁস্তোরা ভবিষ্যতে বড়ো এক রেঁস্তোরার রূপ নেবে।" সাধনদার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে হয়নি। সর্বাঙ্গ শ্রীমণ্ডিত হয়ে আজকের রেঁস্তোরা হাস্‌ছে। হেসে হেসে যেন সুপ্রিয়কে টিট্‌কিরি দিচ্ছে।

রেঁস্তোরার মালিক এসে সুপ্রিয়র কাছে দাঁড়ায়। সুপ্রিয়র সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের খোঁজ-খবর নেয়।

ভদ্রলোকের সুঠাম্‌ দেহ। নিখুঁত বিলিতি সাজ-সজ্জায় সে সজ্জিত। ভালো চেহারা। বাঁ হাতের আঙুলের ভেতর সিগারেট ধরা রয়েছে। কণ্ঠ থেকে ঝুলছে দামী টাই।

—"কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো স্যার ?"

হোটেলের মালিকের কণ্ঠস্বর থেকে করুণা, ভদ্রতা, সৌজন্য আর বিনয় যেন গলে গলে পড়্ছিলো। প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সুপ্রিয়র কেমন যেন দম আট্কিয়ে আসে। পরাজিত সুপ্রিয়। পরাজিত সাধনদা। জীবন-যুদ্ধে তারা হেরে গেছে। জিতেছে এই স্যুটে-বুটে সুসজ্জিত ভদ্রলোকটি। রেঁস্তোরার কর্তা সিগারেট এগিয়ে দেয়। দামী ল্যাভেণ্ডারের গন্ধে বাতাস ভারী। সুপ্রিয় সিগারেট নেয় না। বদলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে।

"শিলং-এ এ রেঁস্তোরার নিশ্চয়ই খুব নাম-ডাক ?" প্রশ্ন করে সুপ্রিয়।

—"তা নাম-ডাক রয়েছে বৈকি ! তবে পাইনউড্, পিক্, মরেলো এদের দাপটের কাছে এ আর কতোটুকুন্!' বলে রেঁস্তোরা মালিক।

—"শুনেছি রেঁস্তোরার সুনামের পেছনে আপনার যথেষ্ট কৃতিত্ব রয়েছে !" পরাজিত, আহত. অপমানিত হবার পর স্তুতিবাক্য ছড়াচ্ছে সুপ্রিয়।

—"আমি এ রেঁস্তোরার পেছনে খেটেছি প্রচুর। একটা ভবঘুরে বাউণ্ডুলের হাতে পড়ে এ রেঁস্তোরা হাবুডুবু খাচ্ছিলো। ভাঙাচুরো একটা দোকানকে গড়ে-পিটে মজবুত করে তুল্তে আমার অসম্ভব মেহনত্ গেছে। রেঁস্তোরার মালিক ছিলো একটা ভ্যাবা গঙ্গারাম। রেঁস্তোরা চালাবে কি ? বউটাকে পর্যন্ত ঘরে সাম্লিয়ে রাখতে পারেনি। রেঁস্তোরার মতো বউকে শেষ পর্যন্ত অন্যের হাতে তুলে দিতে হয়েছে। ওকি মশাই, উঠে পড়লেন কেন ? কফি পড়ে রইলো যে ? শরীর খারাপ লাগ্ছে নাকি ? চলে যাচ্ছেন কেন ? কথার জবাব দিন।"

হোটেল মালিক একনাগাড়ে অনেক কথা বলে যায়। অনেক প্রশ্ন করে। সুপ্রিয় ছিলো নিরুত্তর।

সুপ্রিয় ততোক্ষণে সিঁড়ি বেয়ে তর্তর্ করে নেমে সড়কে চলে এসেছে। তপ্ত লৌহ-শলাকা দিয়ে কানটাকে যেন কেউ জখম করে দিয়েছে। এর চেয়ে বধির হয়ে থাকা অনেক ভালো।

অসহ্য। অসহ্য। সুপ্রিয় এগিয়ে চলে।

শিলং ট্যুরিস্টে ছেয়ে গেছে। ওদের কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরা। মিনতিদির কি সুন্দর চেহারাই না ছিলো! শান্ত জলের নিচে বোধ করি ঘুর্ণি লুকিয়ে ছিলো। না হলে ঘর ভাঙবে কেন মিনতিদি? সাধনদা সেই ঘুর্ণির টানে পড়ে কোথায় তলিয়ে হারিয়ে গেল।

লাবান পাহাড়ের চূড়োতে মিনতিদির বাড়িটাকে এই এতোটুকুন্ দেখা যেতো। ঠিক খেল্‌নার মতো। ক্রিনোলিন্ ফলস্‌কে ভোলা অসম্ভব। পাইন মাউন্ট স্কুল ছাড়িয়ে সেই সুন্দর রাস্তাটা ধরে এগিয়ে গেলে লাবানের স্রোতস্বিনীর ওপর সেই নড়্‌বড়ে ব্রীজটা। রাস্তাটার দু'ধারে পাইন গাছের সারি। আগাছা আর কাঁটাগুল্মের ঝোপ। কি অদ্ভুত নিস্তব্ধতা সেখানে বিরাজ করতো। দিনের বেলা মিঠে রোদ্দুরের ভেতর হাঁটার সেই অপূর্ব মাদকতা। চারধারটা একেবারে চুপ্‌চাপ্। শুধু পাখীগুলো কিচির্‌মিচির্ করছে। কিছুদূরে সাহেবদের সেই ক্লাবটা। সুইমিং পুলের ধারে বড়ো বড়ো রঙীন ছাতার নিচে মেমসাহেব আর সাহেবরা অর্ধ-উলঙ্গ হয়ে পাশাপাশি শুয়ে রয়েছে। নির্মল আকাশে সাদা সাদা মেঘের দল, মাতাল হাওয়ার সেই আমেজটুকু। আজকের দিনে সে ছবি সম্পূর্ণ মুছে গেছে। সব যেন মনের জঙ্গলে হারিয়ে গেছে। ঐ রাস্তাটা সুপ্রিয়র খুব পছন্দ ছিলো। মাঝে মাঝে মিনতিদিকে নিয়ে সুপ্রিয় বিকেল আর সন্ধ্যাবেলা এখানে বেড়াতে এসে অনেকদূর পর্যন্ত হেঁটে বেড়াতো। চলতে চলতে দু'জনে কথার জাল বুন্‌তো। কি অপূর্ব রোমাঞ্চ!

এরই ভেতর একদিন সুপ্রিয়র জ্বর-জ্বর মতো হয়েছিলো। দোকানে সেদিন সে আর গেলো না। সাধনদা অনেকক্ষণ দোকানে চলে গেছে।

—"আজ কিন্তু দোকানে যেতে পারবে না।" মিনতিদি কথা বল্‌তে বল্‌তে ঘরে ঢোকে।

—"না, বেরুবো না, শরীরটা ভালো নেই।" বলে সুপ্রিয়। মিনতিদি সুপ্রিয়র কপালে হাতখানা বুলিয়ে বলে—"যা ভেবেছি।

ছেলের আমার জ্বর এসেছে !" এই বলে মিনতিদি আলোয়ানখানা দিয়ে ওর সর্বাঙ্গ ঢেকে দেয়। শুধু মুখখানা বেরিয়ে থাকে। তারপর সুপ্রিয়র পাশে মিনতিদি বসে তার কপালে, গালে, গলায় হাত বোলাতে থাকে। বাইরে সন্ধ্যের জমাট অন্ধকার। ঘরের ভেতর ধীরে ধীরে অন্ধকার দানা বেঁধে উঠ্‌ছে।

মিনতিদির নরম হাতের স্পর্শে সুপ্রিয়র চোখদুটো আবেশে বুজে আসে। মিনতিদির হাতের আঙুলগুলো কি অদ্ভুত নরম। মাখনের মতো মোলায়েম।

শরীরের কি অপূর্ব গডন মিনতিদির! গালের টোল্‌টা কি চমৎকার। ঝক্‌মকে মুক্তোর মতো দাঁতগুলো। একরাশ কালো কুচ্‌কুচে চুল। মিনতিদির শরীর থেকে দামী ভালো সাবানের মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বেরুচ্ছে। চুল থেকে ভেসে আস্‌ছে তেলের সৌরভ।

—"তোমার ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে। জানালাগুলো বন্ধ করে দিই।"

জানালা বন্ধ করে দেয় মিনতিদি। তারপরে একসময় টুক্ করে লাইটের সুইচটা অফ্ করে দেয় মিনতিদি। মিনতিদির আঙুলগুলো সুপ্রিয়র চুলের ভেতর খেলা করে। সুপ্রিয়র মনে হয় মিনতিদি যেন বড্ডো কাছে সরে এসেছে। ওর শরীরের ঘন ঘন ছোঁয়া পাচ্ছে সুপ্রিয়।

মিনতিদি সুপ্রিয়র সারা অঙ্গে স্নেহের পরশ বোলাচ্ছে। ঘনিষ্ঠ হচ্ছে ক্রমশঃ। খুশির আমেজে সুপ্রিয়র মন-মেজাজ ভরে উঠেছে। তার চোখ প্রায় বুজে এসেছে। মিনতিদি আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছে। মিনতিদিদের বাড়িতেই সুপ্রিয় থাক্‌তো। সারা শিলং-এ আত্মীয়-স্বজন বল্‌তে ওই মিনতিদি আর সাধনদা। এই অল্প কিছুদিনের ভেতর মিনতিদি আর সাধনদাকে তার বড্ডো আপনার মনে হতো। কতোদিন সে রান্নাঘরে মিনতিদির গা ঘেঁষে বসে গন্‌গনে আগুনে রুটি সেঁকেছে। তরকারীর খোসা ছাড়িয়েছে। মাংস পুড়িয়ে ফেলে মিনতিদির বকুনি খেয়েছে। বকুনি দিয়ে পরক্ষণেই মিনতিদি হেসে ফেলেছে।

মিনতিদি ভালো রান্না জান্‌তো। আগুনের আঁচে মুখখানা তার লাল হয়ে উঠ্‌তো। সুপ্রিয় কতোদিন নিজে কাপড়ের খুঁট্‌ দিয়ে মিনতিদির ঘামে ভেজা রাঙা টুক্‌টুকে সুন্দর মুখখানা মুছিয়ে দিয়েছে। মিনতিদি বল্‌তো—"আমার হার্টের যা অবস্থা আর তোমাকে বেশিদিন ঘাম মোছাতে হবে না। তোমাদের রেখে এখন যে কোনোদিন চোখ বুজবো। ছুটি নেবো।" ওকথা শুনলেই সুপ্রিয়র মনটা মোচ্‌ড়াতো। কেমন যেন বিশ্রী লাগ্‌তো সুপ্রিয়র। সুপ্রিয় মিনতিদির মুখে হাত চাপা দিয়ে তাকে থামাতে চাইতো।

সুপ্রিয় আলস্যের দোহাই দিয়ে যদি কোনোদিন স্নান করতে না চাইতো, তবে মিনতিদি কোন্‌ ফাঁকে টুক্‌ করে বালতি ভরতি জল এনে সুপ্রিয়র পেছনদিক থেকে এসে অতর্কিতে ওর মাথা আর শরীরে সবটা জল ঢেলে দিতো। জল ঢেলে দিয়ে হেসে গড়িয়ে পড়তো। মুক্তোর মতো সাদা দাঁতগুলো। টোল্‌-খাওয়া গাল। ভারী ভালো লাগ্‌তো সুপ্রিয়র। কতো কাজই না করতো মিনতিদি। সুপ্রিয়র দাড়ি কামানোর সাজ-সরঞ্জাম মিনতিদি টেবিলের ওপর সাজিয়ে গুছিয়ে রাখ্‌তো। সুপ্রিয়র জন্য মিনতিদি উলের সোয়েটার বুনতো। জুতো ঠিক জায়গামতো না পেয়ে সুপ্রিয় যখন চেঁচাতো তখন মিনতিদি ছুটে গিয়ে জুতো বের করে এনে সুপ্রিয়র পায়ের কাছে রেখে দিতো। সুপ্রিয়র মতো একটা ভবঘুরেকে মিনতিদি মাথায় করে রেখেছিলো। সুখের ভেতর যেন ডুবিয়ে রেখেছিলো। এই মুহূর্তে মিনতিদি যেন বড্ডো কাছে সরে এসেছে। ঘরের ভেতর নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। এদিকে মিনতিদির উষ্ণ প্রশ্বাস। হ্যাঁ, প্রশ্বাস বড্ডো উষ্ণ। সুপ্রিয়র চোখে মুখে যেন আগুনের হল্‌কা ছড়াচ্ছে। মিনতিদি বড্ডো কাছে, বড্ডো কাছে সরে এসেছে।

হঠাৎ মিনতিদি একটা ক্ষুধার্ত রক্তলোলুপ বাঘিনীর মতো সুপ্রিয়র ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বড্ডো অতর্কিতে ঘটে যায় সবকিছু। মিনতিদি দু'হাতে সুপ্রিয়কে জড়িয়ে ধরে কঠিন নিষ্পেষণে থেঁতলিয়ে ফেল্‌তে চায়

ঢলে পড়েছে। মিনতিদিকেও সে বাঁচাতে পারেনি। ময়লা, নোংরা জলে অবগাহনের জন্যে পা-পা করে হেঁটে মিনতিদি এগিয়ে গেছে। নেমে পড়েছে কাদার ভেতর।

সুপ্রিয় কি চেষ্টা করলে মিনতিদিকে বাঁচাতে পারতো? হয়তো পারতো, হয়তো পারতো না।

সুপ্রিয় চোরের মতো পালিয়ে বেঁচেছে।

চৌরঙ্গীতে যে মিনতিদিকে সুপ্রিয় দেখলো, সে শিলং-এর মিনতিদির প্রেতাত্মা। মিনতিদির অনেক অনেক আগেই মানসিক মৃত্যু ঘটেছে। শারীরিক মৃত্যু ঘট্‌লো রাজগীরে।

সুপ্রিয় খবরের কাগজে পড়েছিলো টেস্ট্-টিউবে নাকি জীব সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। যন্ত্রাগারে নাকি মানব-ভ্রূণ সৃষ্টি সম্ভব হবে। বন্ধ্যা নারীর সন্তান কামনা পূর্ণ করা যাবে।

মানুষ তার নিজের জীবকোষ নিয়ন্ত্রিত করার এবং জীবকোষকে বিশেষ পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাবার পদ্ধতিটি জেনে ফেল্‌বে।

নিরেনবারগ, হোলি, নেফাক্, এডওয়ার্ড,--জীবন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এঁদের আজ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

সুপ্রিয় ভাবে বেঁচে যাবে অনেক মিনতিদি। বন্ধ্যা জমিগুলোতে ফসল ফল্‌বে। জমি হয়ে উঠ্‌বে সুজলাসুফলা।

৯

রাজগীরের রেস্ট্ হাউসের সাত নম্বর ঘরে সুপ্রিয় বসে আছে। রাজগীরে বেড়াতে এসেছে বিকাশ মিত্র, তার স্ত্রী আর তাদের পনেরো বছরের মেয়ে লীনা। বিকাশ মিত্র এই রেস্ট্ হাউসেই আতিথ্য-গ্রহণ করেছে।

মেয়েটা লুঙ্গী পড়েছে। মেয়েটা যেন ফ্যাশানের দামাল হাওয়ায় উড়্ছে। তরতরে তাজা-তরুণী, সুন্দর দেহরেখায় উঁচু-নিচু ঢেউ। সারা অঙ্গে যৌবনের হাতছানি, রূপের দিকে তাকিয়ে থাক্তে ইচ্ছে করে।

বিকাশ মিত্র কথার তুব্ড়ি ওড়াচ্ছে। কলকাতার কোনো প্রাইভেট ফার্মের সে উচ্চপদস্থ কর্মচারী।

—"বেঁচেছি মশাই, বেঁচেছি। শহুরে জীবনের টানাপোড়েন থেকে বেঁচেছি। মহানগরীতে ছিন্‌তাই-এর সংখ্যা বেড়েছে। মেয়ে-ছেলে নিয়ে সন্ধ্যের পর পথে-ঘাটে বেরুনো দুষ্কর। অশালীন আচরণের চরম।"

—"এখানে সে-সব কিছুই নেই।" বলে সুপ্রিয়।

—"তাই তো রাজগীরে সকাল-সন্ধ্যায় গোটা পরিবার নিয়ে চরকি-বাজির মতো ঘুর্‌ছি। ঘুর্‌ছি আর ঘুর্‌ছি, শঙ্কাবিহীন চিত্তে এবং নির্ভয়ে। এখানে ঠাণ্ডা, শান্ত জীবন। লোকগুলো সহজ, সুস্থ জীবন যাপন করছে। সরল মানুষগুলো। ভারী ভালো লাগ্ছে আমার।"

বিকাশ মিত্র কথা শেষ করবার আগেই লীনা বাবার গলা জড়িয়ে ধরেছে।

—"এই ছাড়ো। দ্যাখো, এতো বড়ো মেয়ের কাণ্ডখানা দ্যাখো! ভদ্রলোক ভাবছেন কি বলো দেখি!" বিকাশবাবু মেয়েকে কোল

থেকে নামাতে চেষ্টা করে। সুপ্রিয়র ছ'চোখে কৌতুকের ঘনীভূত ছায়া।

—"উনি যা ইচ্ছে ভাবুন, আমি এখন ড্যাডির কোলে চড়ে বসেছি।"

—"না, না। তুমি যতো বার ইচ্ছে ড্যাডির কোলে চড়ে বসো আমি কিছু ভাববো না।" বলে সুপ্রিয়।

—"তাকিয়ে ছাখো আমলকির ডালে ছোট ছোট পাতা। চিক্‌রি-চিক্‌রি। ওধারে কালো মেঘের জঙ্গল।"

—"তুমি দেখছি গাছপালা সম্বন্ধে ভীষণ অভিজ্ঞ!" বলে সুপ্রিয়।

—"হবো না কেন? ড্যাডি আমাকে গাছপালার সমস্ত নাম শিখিয়েছে।" লীনার অঙ্গে স্লিভলেসের লেটেস্ট কাট্।

—"জানেন সুপ্রিয়বাবু!" বিকাশবাবু চুরুটে অগ্নিসংযোগ করে। "আমার সখ-আহ্লাদের সীমা-পরিসীমা নেই। জানবার বুঝবার শেখবার আগ্রহ রয়েছে প্রচুর। মানে, বল্‌তে পারেন চল্লিশের কোঠায় পৌঁছেও প্রচুর এনারজি মজুত রয়েছে। সমস্ত কিছু অদ্ভুত জিনিস দেখবার আর সে সম্বন্ধে জানবার সখ আমার রয়েছে। ফাঁক পেলেই বইপত্তর নিয়ে বসে পড়ি। পড়াশুনো করতে আমার খুব ভালো লাগে। এর ভেতর লাইফ ইন্ স্পেস্, ফ্লাইং সসার, স্কটল্যাণ্ডের লখনেস্ হ্রদের অতিকায় সরীসৃপ বা ডাইনোসর, হিমালয়ের এটি বা এ্যাবোমিনেবল স্নোম্যান্ সম্বন্ধে অনেক কিছু পড়ে ফেলেছি।"

বিকাশবাবু একমুখ ধোঁয়া ছাড়ে।—"ওগো তোমার এতো লজ্জা কিসের শুনি! পরদার ওধার থেকে কেবল উঁকি-ঝুঁকি দিচ্ছো কেন? সুপ্রিয়বাবু আমাদের পর নন।" এরই ভেতর মেয়ে ভেতরে চলে গেছে। মা ঘরে ঢুকেছে। ঘন পল্লবে ঘেরা ছুটি চোখ। শান্ত নির্জীব চোখ।

শান্ত কালো জলের মতো গভীর। স্থির, অচঞ্চল। টিকালো নাক, ধবধবে গায়ের রঙ্। লাবণ্যমণ্ডিত মুখশ্রী।

—"কিগো, লজ্জা করছে নাকি? আলাপ করো সুপ্রিয়বাবুর সঙ্গে। আমাদের মতো উনিও কিছুকাল হলো রেস্ট্ হাউসে এসে উঠেছেন—লাবণ্য দেবী। মানে, আমার স্ত্রীর বড্ডো লজ্জা। আমি বলি, মেয়ে বড়ো হয়েছে। আমার মাথার চুলে পাক্ ধরেছে। তোমার বয়সও সাঁইত্রিশ পেরিয়ে আটত্রিশে পা দিয়েছে। এখনই তো পর-পুরুষের সঙ্গে আলাপের সময়। ভয়ের দিন কেটে গেছে!" হা হা করে বিকাশবাবু হাসে। লাবণ্য চোখ তুলে তাকায়। সুপ্রিয়ও তাকায়। চার চোখে মিলন হয়। দৃষ্টিতে দৃষ্টি আটকিয়ে থাকে। সুপ্রিয়র ঘরের জানালা দিয়ে তাকালে বিকাশবাবুদের ঘরের জানালা স্পষ্ট দেখা যায়। আর দেখা যায় ঘরের বেশ খানিকটা অংশ। আজ দু'দিন ধরে বেশ কয়েকবার এসে লাবণ্য ওদের ঘরের জানালায় দাঁড়িয়েছিলো। সুপ্রিয় দাঁড়িয়েছিলো তার জানালায়। সুপ্রিয় দৃষ্টি ফেরাতে পারেনি। দু'জনের দৃষ্টি-বিনিময় হয়েছে ঘনঘন।

লাবণ্য কাজের ছুতো করে জানালার ওপরকার ঝুল্ ঝেড়েছে। জানালার পরদা বারে বারে ঠিক্ঠাক্ করেছে। পরদার কাপড় থেকে স্প্রিং খুলে নতুন স্প্রিং পরিয়েছে। মাঝে মাঝে কম্পিত ভীরু দৃষ্টি ফেলেছে সুপ্রিয়র জানালার দিকে। চোখে চোখ পড়তে লজ্জায় সরমে আরক্তিম হয়ে চোখ নামিয়ে নিয়েছে। কিন্তু সে ক্ষণকালের জন্য, পরমুহূর্তে চোখ তুলে তাকিয়েছে। সুপ্রিয় পুরুষমানুষ। সে তাকাতে কার্পণ্য করেনি। এই তাকানো তাকানো খেলা দু'জনের ভালো লেগেছে। দৃষ্টি-বিনিময়ের ফাঁকে ফাঁকে ভাব আর ভাষার বিনিময় হয়েছিলো।

সুপ্রিয় একজোড়া তাজা চোখ পেয়ে সব ভুলেছিলো। বউটির মাখন মাখন গা, পুরুষের অনায়াসে হৃদয় হারাতে ইচ্ছে করে।

সুপ্রিয়কে উদ্দেশ্য করে বিকাশবাবু বলে—"আমি লাবণ্যকে সবসময় বলি—লজ্জা-সরম ছেড়ে মানুষের সঙ্গে খানিকটা সময় কথাবার্তা বলো দিকিন্। ঘরকুনো হয়ে থেকো না। বলুন দেখি মশাই, এরকম ঘরকুনো বউ নিয়ে কি আজকালকার দিনে চলে?"

একরাশ লজ্জাবৃষ্টির মধ্য দিয়ে পা চালিয়ে, কি একটা আন্‌বার ছুতো করে লাবণ্য পালায়। সুপ্রিয় মাথা হেঁট করে বসে থাকে।

সে মনে মনে ভাবে, ভদ্রলোক কি জানে তার স্ত্রী পর-পুরুষের দিকে তাকিয়ে আত্মহারা হয়! জানালায় দাঁড়িয়ে গভীর কালো চোখ মেলে ধরে প্রেম-নিবেদন করে! দৃষ্টি দিয়ে পর-পুরুষের সারা মনে প্রেমের পরশ বুলিয়ে যায়! স্বল্প আর মৃদুভাষিণী লাবণ্য সুপ্রিয়র মনে দু'দিনেই নেশা ধরিয়েছে।

বিকাশবাবু কি যেন একটা বই পড়ছিলো। বইটার কোনো এক পাতায় কাগজ গুঁজে সে বইটা বন্ধ করে রেখেছিলো। এবার বইটা খুলে সে বলে—"দুটো লাইন পড়েছি। দেখুন কি লিখেছে!"

তারপর বিকাশবাবু পড়তে সুরু করে,

—"Each female can bring out different kind of emotion from a man". লাইন দুটো পড়েই বিকাশবাবু প্রশ্ন করে —"আপনার কি মনে হয়?

সুপ্রিয় বলে—"পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু করেছেন নাকি?"

হা-হা করে হেসে ওঠে বিকাশবাবু।

—"এই বয়সে!" বলে বিকাশবাবু।

—"এই তো বয়স।"

—"কি যে বলেন! ষোলো বছরের কন্যা। লোকে কি বল্‌বে!"

—"ষোলো বছরের কন্যা আর চুলে পাক ধরেছে—এই দুই-এর আড়ালে দিব্যি আত্মগোপন করবেন। ঐ দুটো হবে আপনার বর্ম।"

—"দুটোই প্রকাণ্ড disqualification, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পথে দুস্তর বাধা। তবে হ্যাঁ। আপনি চেষ্টা করলেই পারবেন।" বলে বিকাশবাবু।

—"রক্ষে করুন মশাই! ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে আমাকে রেহাই দিন।"

—"লাবণ্য, লাবণ্য! চা-এর কি হল?" ভদ্রলোক চেঁচিয়ে স্ত্রীকে ডাকে। অপর পক্ষ থেকে কোনো উত্তর আসে না।

"ঐ দেখুন! আপনাকে দেখে লাবণ্য পালিয়েছে। ভীষণ মুখ-চোরা মশাই আমার স্ত্রী। পুরুষমানুষ দেখেছে কি অমনি পালাই-পালাই ভাব। কিছুতেই শোধ্‌রাতে পারলুম না।"

সুপ্রিয় মৃদু হাসে। বই-এর অন্য এক পাতা ততোক্ষণে বিকাশবাবু মেলে ধরেছে।—"দেখুন এক স্বনামধন্য ব্যক্তি কি বলেছেন—**I simply cannot be without a love affair. My relationship with a woman is always a beautiful fantasy that enriches me in my artistic endeavour.** চমৎকার লিখেছে তাই না, কি বলেন!"

—"মহাশয়ের মনটা পুরোপুরি সবুজ আর কাঁচা।"

—"চুপ, চুপ। মেয়ে বড়ো হয়েছে। স্ত্রী আমার সতীসাধ্বী, বড্ডো লাজুক। এসব সম্বন্ধে তার কোনই ধ্যান-ধারণা নেই। শুন্‌লে মনে কষ্ট পাবে। সত্যি সত্যি কিছু একটা ভেবে বসে থাক্‌বে। তা মশাই বিদেশে জন্ম নিলে একটু-আধটু চেষ্টা চালাতাম। কিন্তু এখানে! ভারতীয় ট্র্যাডিশানে তুলসী পাতা আর গঙ্গাজল গায়ে ছিটিয়ে ওসব কাজ অসম্ভব মশাই। অসম্ভব। আর এরকম বউকে ঠকানো, বিবেকটাকে ভেঙে খান্‌ খান্‌ করে ছাড়া উপায় নেই। ভাবতেই পারিনে মশাই। আমার বউ লাবণ্য আমাকে ছাড়া কিছুই জানে না। লাবণ্যকে নিয়ে মাঝে মাঝে একটু-আধটু রগড় মশ্‌করা করি। পাঁচটা বই-পত্তর পড়ে জ্ঞান অর্জন করি। নাটক উপন্যাস পড়ি, আদিরস সম্বন্ধে জ্ঞান আহরণ করি। ব্যস্‌, তার বেশি কিছু নয়।

লাবণ্যর ঘন পল্লবে ঘেরা চোখ দুটির সঙ্গে আবার দৃষ্টি বিনিময় করবার জন্যে সুপ্রিয়র মনটা লালায়িত হয়ে ওঠে। সুপ্রিয়র মনে হয় ভদ্রলোক যেন বাড়াবাড়ি করছে।

প্রজাপতিগুলো বেশ মেজাজে রয়েছে। একটা-দুটো উড়ে উড়ে এসে সুপ্রিয়র শরীরে ঝাপ্‌টা খেয়ে পড়ে। খানিকক্ষণ বসে উড়ে

চলে যায়। জানালা দিয়ে তাকালে দেখা যায় সামনে তুরন্ত অরণ্য। মাঠে অফুরন্ত সবুজের বন্যা। রকমারি মরসুমী ফুলের বিছানা পাতা।

রেস্ট্ হাউসের কাছে সড়কের একপাশ দিয়ে মুণ্ডিতমস্তক বৌদ্ধ ভিক্ষুরা চলেছে।

—"আপনার তো ঐ একটি মেয়ে। বংশরক্ষার জন্যে একটি ছেলেরও প্রয়োজন রয়েছে। বংশ রক্ষা করতে হবে তো!" বিকাশবাবুকে উদ্দেশ্য করে সুপ্রিয় বলে।

—"রক্ষে করুন! আর নয়, মেয়ে বড়ো করে তুল্তে হিম্সিম্ খাচ্ছি। আজকালকার মেয়েদের দাবী-দাওয়া অনেক। লাবণ্যর সে তুলনায় চাহিদা একেবারে নেই। জনসংখ্যা বাড়িয়ে লাভ আছে কিছু! ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার দিকে তাকিয়ে দেখুন। জনসংখ্যার চাহিদা মেটাতে শুনেছি সমুদ্রতল থেকে আহার্য বস্তু সংগ্রহের চেষ্টা চলছে।"

ওধারের পথ ধরে তুটো বিদেশী ছেলেমেয়ে চলেছে। মাথা কামানো, গায়ে নামাবলী চাদর, জপের মালা কণ্ঠে ও হাতের কব্জীতে জড়ানো, পায়ে খড়ম। গায়ে গেরুয়া পাঞ্জাবি। পথ ধরে তারা এগিয়ে চলেছে। দেশ ছেড়েছে কিসের লোভে কে জানে!

হিন্দুধর্ম সাংঘাতিকভাবে আকর্ষণ করেছে এদের – নিজের দেশের সবকিছুতেই বুঝি অতৃপ্তি। মনে অশান্তির ঝড়। তাই শান্তির লোভে সাইক্লোনের বেগ নিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে।

কৃষ্ণনামের মাহাত্ম্য আর হরেকৃষ্ণের ধ্বনি যা ভারতে পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রেমের বন্যা বইয়ে দিয়েছিলো, তারই ঢেউ গিয়ে লেগেছে পশ্চিমের দেশগুলোতে। বস্তুতান্ত্রিক দেশগুলোতে জাগিয়েছে প্রচুর সাড়া।

—"ভেবেছি নতুন একটা ব্যবসায়ে হাত দেবো।" বলে বিকাশবাবু।

—"কিসের ব্যবসা?"

—"ভেবেছি নামাবলী চাদর আর জপের মালা, রুদ্রাক্ষের আর নিম কাঠের, বিদেশের বাজারে চালান দেবো। হরিভক্তি ও দেশে যে রেটে বেড়ে চলেছে। হু-হু করে কাট্‌বে।"

লাবণ্য চা নিয়ে ঢুকেছে। মোলায়েম গা। মোলায়েম দৃষ্টি। মাথায় ঘন কালো চুল। পাত্‌লা ঠোঁটে ঢেউ খেলানো হাসি। লাবণ্য ঘোম্‌টা কপালের ওপর আরো খানিকটা নামিয়েছে।

—"এই নিন চা।" অল্প কয়েকটি কথা। হিমশীতল কণ্ঠ। কোনো উত্তাপ নেই। কিন্তু তাকালো যখন, পরস্পরের দৃষ্টি-বিনিময় হলো। দুটি অশান্ত হৃদয়ে বুঝি ঝড় উঠ্‌লো।

চাউনির সাহায্যে দু'জনের ভেতর সাঙ্কেতিক ভাষায় কতো কথা হলো। শুধু জানতে পারলো দুটি অশান্ত হৃদয়। স্বামীর দিকে পেছন ফিরে লাবণ্য চা-এর কাপ এগিয়ে দিলো। চায়ের প্লেট আর কাপ ধরবার সময় সুপ্রিয় আল্‌গোছে লাবণ্যর আঙুল্ চেপে ধরলো। আর লাবণ্যর আঙুলগুলো ইচ্ছে করেই বন্দীদশা থেকে মুক্তি নিতে চাইলো না। কয়েক মুহূর্ত। কিন্তু কি উত্তেজনা! কি উন্মাদনা! কি রোমাঞ্চ! সুডৌল সোনার কাঁকন পরা হাতটা থর থর করে কাঁপ্‌ছে। স্পষ্ট টের পেলো সুপ্রিয়। শান্ত শীতল চোখের সেই মধুর চাহনি। দু'জন দু'জনকার যেন কতো যুগ আগেকার চেনা।

—"আমার স্ত্রী লাবণ্য অন্তঃকরণের ব্যাপারে বড্ডো ঠাণ্ডা। বড্ডো হিম-শীতল।—সুপ্রিয়বাবুর সঙ্গে দু'চারটে কথা বলো না গো!"

আবার হা-হা করে হেসে ওঠে বিকাশবাবু। নিজ রসিকতায় নিজেই মুগ্ধ। লাবণ্য মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে দ্রুতপায়ে প্রস্থান করে। সুপ্রিয়র সারা শরীর যেন অবশ হয়ে গেছে। রোমাঞ্চে সমস্ত শরীরে কাঁটা দিচ্ছে। দেহস্পর্শে এতো মাদকতা! এতো উত্তেজনা! মাত্র দু'দিনের, ক্ষণস্থায়ী এই পরকীয়া প্রেম তাকে আনন্দের শীর্ষদেশে তুলে ধরেছে। একটু হাসি। একটু পরশ। ক্ষণিকের এই প্রেমের খেলা। অপূর্ব আর মধুর।

চা-এর কাপ-প্লেট উপলক্ষ করে কয়েক মুহূর্ত দু'জনের ভেতর এক অদৃশ্য সেতু-বন্ধনের সৃষ্টি হয়েছিলো। লাবণ্য হাত সরাতে বোধ করি ভুলে গিয়েছিলো। সুপ্রিয়র ঠিক অবাধ্য ছেলের মতো বেয়াড়াপনা করবার সাধ জেগেছিলো।

মনে হয় দূরের শিলাখণ্ডগুলো নির্জীব নয়। ওরা যেন কথা কয়। ওদের বুকভরা শুধু কথা। যুগ যুগের ইতিহাস ওরা সারা অঙ্গে জড়িয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছে। দূরে দূরে শাল, বোঁদ আর বাঁশের জঙ্গল। মকাই-এর ক্ষেত। সবুজের সমারোহ। তপোবনের নিবিড় শান্তি নিয়ে বুদ্ধদেবের বিশ্রামস্থল। পাহাড়ের পাথুরে হাড়-পাঁজর হাতড়ে বেড়াতে আর ইচ্ছে যায় না। সুটিং-এর ফাঁকে ফাঁকে ওই একটা কাজ ছিলো সুপ্রিয়র।

কতো দুপুরে সে শুনতে পেয়েছে ভগ্নস্তূপে, অরণ্য-মর্মরে চাপা কান্নার আভাষ—ফেলে-আসা যুগের স্মৃতি বুকে ধরে সব গুম্‌রিয়ে মরছে। কতো আঁখিজল এধার ওধারে পাথরের বুকে শুকিয়ে রয়েছে। কতো দীর্ঘশ্বাস বুঝি এখনো বন-মর্মরের সঙ্গে ভেসে বেড়ায়। বাতাসে এলোমেলো পাতা ওড়ার সঙ্গে সব কিছু সুপ্রিয় কান পেতে শোনে। যে রোমাঞ্চ জাগে তার বোধকরি জুড়ি নেই। কিন্তু আজকের এ মুহূর্তের অনুভূতির বুঝি তুলনা নেই। অনিশ্চিত ভাবনাগুলো এখন দ্বিধাগ্রস্ত, মূহ্যমাণ। আজ এ মুহূর্তে শুধু নতুন চিন্তাধারা। সূক্ষ্ম আর এক অনুভূতি। আজকের এ অনুভূতি, এ রসবোধ অতীত যুগের কোনো প্রেয়সীর জন্য নয়। সুধাকণ্ঠী মোহিনীরা যারা বিলীন হয়েছে অনেক যুগ আগে, তাদের মায়ায় আজ সে ভোলেনি। পুরোনো যুগের অভিসারিকার দল রাজগৃহের রাজপথে সেদিন বেরিয়েছিলো রোমাঞ্চের পাখায় ভর করে। সেদিন ছিলো দ্যূতসভা, গণিকালয়, বৌদ্ধ-বিহার, দেবদাসী, প্রাকারের শীর্ষে দৌবারিক, রূপসীদের নূপুর শিঞ্জিত চরণ-যুগল। মুক্তা, প্রবাল, ইন্দ্রনীলের ছটা। মালতী, মল্লিকা, কুরুবক, মাধবীর ঘ্রাণে নাসারন্ধ্র বিভ্রান্ত হতে এখন আর মন চাইছে না। রাজগীর তার নূতন উন্মাদনা

নিয়ে সুপ্রিয়র সামনে উপস্থিত হয়েছে। নতুন সম্ভাবনা। নতুন রোমাঞ্চ। দুটি চোখের চাউনি, দুটি পাতলা ঠোঁটের হাসি, দুটি নরম তুল্‌ তুলে আঙুলের পরশ। লাবণ্য যুবতী নয়। তার মেয়ে রয়েছে, যার বয়স ষোলো বছর। চল্লিশের উর্ধ্বে স্বামীর বয়স। রাতের বেলা লাবণ্য স্বামীর বাহুপাশে ধরা দেয়। আলিঙ্গণে আবদ্ধ হয়ে প্রেমের খেলায় মাতে। কিন্তু আজ দু'দিনের এ অনুভূতি বোধকরি সুপ্রিয়র মতো লাবণ্যকেও মোহাবিষ্টা করেছে। ঘর সংসারের ওপরে, স্বামী কন্যা ছাড়াও, অন্য এক অমৃতলোকের সন্ধান পেলো কি লাবণ্য? বিকাশবাবু লাবণ্যকে একটা জড়োমাংসপিণ্ড বলেই ধরে নিয়েছিলো। ভোগ্যবস্তুর সামিলই ছিলো লাবণ্য।

সূক্ষ্ম রসানুভূতির আওতার ভেতর লাবণ্য কখনো পড়েনি। লাবণ্যর সমস্ত অনুভূতি জড়িয়ে ছিলো বিকাশবাবুকে ঘিরে। ভুল। মহাভুল। মানুষ এভাবেই ভুল করে। বিকাশবাবুও ভুল করেছিলো। মনের তন্ত্রীতে ঠিক জায়গামতো ঘা দিলে সুপ্ত অনুভূতিগুলো জেগে ওঠে। মনোবীণার তারে ঘা পড়লে জেগে ওঠে সুরের মূর্চ্ছনা। নর-নারী কালপাত্র সমস্ত ভুল করে বসে। নতুনের সন্ধানে দিশেহারা হয়। চারধার হাতড়িয়ে মরে। অন্তরের আদান-প্রদানের জন্যে আকুল হয়। সুপ্ত লাবণ্য জেগে উঠেছে। হঠাৎ সুপ্রিয়র চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে।

—"শুনেছেন মশাই! বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মস্তক কাটা গেছে। কি লজ্জার কথা! পথভ্রান্ত, দিক্‌ভ্রান্ত ছেলের দল একি করলো! দেখুন দেখি নবযুগের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর মশাই, দয়ালু মহৎ হৃদয়-সম্পন্ন ব্যক্তি, পরের দুঃখে যাঁর হৃদয় কেঁদে উঠতো, আধুনিক বাংলা ও গদ্য ভাষার যিনি আদি জনক, আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রবর্তক। স্ত্রীজাতির প্রতি সর্বপ্রকার অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রামী—পরদুঃখকাতর, মহাপ্রাণ, প্রেমিক, সিংহপুরুষ। তাঁর কি দুর্গতি! ভাবুন দেখি! তাঁর মূর্তি থেকে মস্তক ধরচ্যুত করা হয়েছে। ছেলেগুলো বড্ডো ভুল করলো মশাই।" বিকাশবাবু রুমাল দিয়ে মুখ মোছে।

সুপ্রিয় তাকিয়ে দেখে বিকাশবাবু লক্ষ্ণৌ চিকনের কাজ-করা পাঞ্জাবি পরেছে।

বিকাশবাবু সুরু করে—"জানেন বোধ করি, রাজগীরের এই কুণ্ডগুলোকে কেন্দ্র করে অনেক ইতিহাস গড়ে উঠেছে। তীর্থ-যাত্রীদের গোপন মনের করুণ কাহিনী অবলম্বন করে সব ইতিহাস। দক্ষিণ আফ্রিকার একটা গহ্বরকে কেন্দ্র করে তীর্থযাত্রীর সমাবেশ ঘটেছিলো। ওই গর্তটাই নাকি কিম্বার্লির বিশ্ববিখ্যাত হীরক খনির আদি। গত শতকে আমেরিকার কালিফোর্ণিয়া কিংবা অস্ট্রেলিয়ার ভিক্টোরিয়া মানুষকে লুব্ধ করেছিলো সোনার ছলনায়—কতো গল্প, কতো ইতিহাসের সৃষ্টি হয়েছে। ভার্জিনিয়ার ভাগ্য তামাকে। ক্যারিবিয়ান আখে। মালয় ইতিহাস সৃষ্টি করেছে রবারে। মধ্যপ্রাচ্যের নিয়তি নির্ধারিত হয়েছে তেলে। রাজগীরের ভাগ্য জড়িয়েছে তীর্থযাত্রীদের ভাগ্যের সঙ্গে।"

—"আমার মনে হয় এখনো রাজগীরের মাটির নীচে অনেক পুরোনো সম্পদ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।"

—"নিশ্চয়ই। গভর্ণমেণ্ট হুঁশিয়ার। যাকে-তাকে মাটি খুঁড়তে দেবে না। অনেক তীর্থযাত্রী এসব মতলব নিয়ে এখানে আসে।"

সুপ্রিয় কথা বল্‌ছে বটে, কিন্তু কতোগুলো এলোমেলো চিন্তা তার মগজে ঘুরপাক্ খাচ্ছে। এক অনির্বচনীয় সুখে মনটা ভরে উঠেছে।

কয়েকটা রক্তজবা বাংলোর প্রাচীর টপ্‌কে সড়কের দিকে আরক্তিম লজ্জা নিয়ে মুখ বাড়িয়েছে। দেয়ালের ওপাশে কয়েকটা ধানী লঙ্কা গাছ ধপ্‌ধপিয়ে বেড়ে উঠেছে। কিছুক্ষণ আগে এক পশ্‌লা বৃষ্টি হয়েছিলো। কচি-কাঁচা ঘাসের গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। মাটির গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। বাগানে টবে সারিবন্দী ক্যাক্‌টাস্।

—"এখানে এসে শুধু শুয়ে বসে থাক্‌তে ইচ্ছে করে। কলকাতার সেই স্নায়ু-যুদ্ধের ভীতি এখানে নেই। সহরের সভ্যতা মানেই ব্লাড্ প্রেসারের আধিক্য আর হার্টের নানা ব্যাধি। এখানে শান্তি আর

অবকাশের ছড়াছড়ি। এখানে অবাধ্য ছেলের মতো বেয়াড়াপনা করতে ইচ্ছে করে। যা ইচ্ছে তাই করতে ইচ্ছে করে। যা মন চায় তাই খেতে কোনো আপত্তি নেই। খেয়ে ভাবনা হয় না। বরং আরো খাবার সাধ জাগে। এখানে আনাড়ীর মতো ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে করে। গাফিলতির ঝড় বইয়ে দিতে ইচ্ছে করে। দায়-দায়িত্ব বিহীনভাবে ঘুরে বেড়াতে সখ যায়। সহরে যা খেসারত দিয়েছি সুদে-আসলে এখানে তা তুলে নিতে ইচ্ছে করে।" বিকাশবাবু মুখের লাগাম তুলে নিয়েছে। কথার ঘোড়দৌড় ছুটিয়েছে।—"জানেন মশাই, লাবণ্যকে ছাড়া একদণ্ড তিষ্ঠোতে পারিনে। আর লাবণ্যরও ওই একই অবস্থা। আমাকে দু'দণ্ড চোখের আড়াল হতে দিতে চায় না। আজ এতোবছর ধরে একটা মধুর সম্বন্ধ বজায় রেখেছি। বলি বটে লাবণ্যকে এখানে-ওখানে যেতে। মুখ বুজে ঘরের কোণে পড়ে থাকতে বারণও করি। কিন্তু সত্যি কথা বল্‌ছি মশাই, ওটা আমার মনের কথা নয়। লাবণ্য ঘর ছেড়ে বেরুলে আমার মনটা কেমন কেমন করে। আমি পছন্দ করিনে ওর বেরুনো। তারপর অন্য পুরুষের সঙ্গে কথাবার্তা। না। না। ও আমার একদম পছন্দ নয়। তবে মাঝে মাঝে কিছু বলে-টলে লাবণ্যকে আমি তাতিয়ে তুলি। একটু মজা করি। বলি ঘর ছেড়ে বেরুতে পারো না! লোকজনের সামনে মুখ তুলে কথা বল্‌তে পারো না! এসব বলা আমার একটা বিলাস। লাবণ্য আমার মনের কথা বোঝে। ইঙ্গিতটুকুর সারমর্ম সে এতোদিনে বুঝে নিয়েছে। তাই ঘর ছেড়ে একলা পথে বেরুতে তার যতো আপত্তি। বেরুলে শঙ্কিত দৃষ্টি। কথা বলার সময় আড়ষ্ট ভাব। লোক দেখলে ঘোম্‌টা নামিয়ে সে সরে পড়ে।" হা হা করে বিকাশবাবু হেসে ওঠে।

—"কি মশাই, আমার হোম্‌ ডিপ্লোমেসীর আপনি প্রশংসা করছেন কিনা।"

সুপ্রিয়কে জানাতে হয় যে, সে মনে মনে বিকাশবাবুর হোম্‌ ডিপ্লোমেসীর যথেষ্ট প্রশংসা করছে।

—"সত্যি কথা বলতে কি মশাই, আমি আর লাবণ্য অভিন্ন-হৃদয়। দু'জন দু'জনকে ছেড়ে একদণ্ডও থাকতে পারিনে। লাবণ্যর ওই লজ্জাটুকু, ওই সংশয়টুকু, ওই জড়তা, ওই ভীরু-ভীরু ভাব, আমার জীবনের পথে চলার পাথেয়। লাবণ্য আমাকে ইন্‌স্‌-পিরেশন্ যোগায়। মনটাকে সজীব রাখে। লাবণ্যর রূপ, যৌবন, আদর, ভালবাসা, সেবা যত্ন ছাড়া আমার পক্ষে জীবন-যুদ্ধে এতোদূর পর্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে আসা অসম্ভব ছিলো।"

—"আপনি পত্নী-প্রেমে যে এতটা হাবুডুবু খাচ্ছেন তা আমার জানা ছিলো না।" বলে সুপ্রিয়।

—"কবিতা পড়ি। উপন্যাস পড়ে অনেক নারীর স্বপ্ন দেখি। কিন্তু কপালে ওই একটি নারী জুটেছে। তার বেশি জোটেনি। আর জোটবার আশাও নেই। আমার সুখ-দুঃখ, ভালোবাসা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, নিরাশা সব লাবণ্যকে ঘিরে।"

প্রচুর আনারস নিয়ে বাংলোর গেট পার হয়ে কম্পাউণ্ডে একটি লোক ঢুক্‌লো।

—"আনারস খাবেন স্যার?" প্রশ্ন করে বিকাশবাবু।

—"না।" উত্তর দেয় সুপ্রিয়।

—"আনারস খান। আনারসে স্টার্চ নেই বললেই চলে। কাজেই যারা শরীরের ওজন বৃদ্ধি সম্বন্ধে সতত সংশয়গ্রস্ত, অনায়াসে তারা এই ফলটি আহার্য বস্তু হিসেবে বেছে নেয়।" বলে বিকাশবাবু।

—"সুদূর ব্রাজিলে আনারসের জন্ম।" সুপ্রিয় তার ভূগোলের জ্ঞানের বহর খানিকটা জাহির করে।

—"সহস্রাক্ষ ইন্দ্রের নন্দনকাননের প্রেয়সী এই আনারস। তাই ওর দেহে এতো চোখের বাহার।" বলে বিকাশবাবু। তার চুরুটটা নিভে গিয়েছিলো, তাতে অগ্নিসংযোগ করে বিকাশবাবু সুরু করে—"আজ কোন্‌দিকে বেড়াতে বেরুবেন? মণি-নাগ মন্দিরের পথে? না, সপ্তপর্ণি গুহার পথে?"

সুপ্রিয় বলে—"এখনো কিছু ঠিক করিনি।"

· "ওসব ধামাচাপা দিয়ে চলুন আমার সঙ্গে মাছ ধরতে। পিঁপড়ের ডিম, সাদা কেঁচো দিয়ে চার তৈরী। ফাৎনা নড়লে দেখবেন কি sensation! আমি যে জলাশয়ে আপনাকে নিয়ে যাবো সেখানে প্রচুর চিংড়ী পাবেন।"

—"চিংড়ী মাছ আমার বড্ডো প্রিয়।" বলে সুপ্রিয়।

—"জানেন তো ভারতীয় চিংড়ী মাছের চাহিদা বর্হিবিশ্বে—বিশেষ করে—যুক্তরাষ্ট্রে খুবই রয়েছে। ভারতের সংলগ্ন সমুদ্র-গুলোতে বিশেষ করে বঙ্গোপসাগরে চিংড়ী মাছ পাবার অফুরন্ত সম্ভাবনা রয়েছে। আজ মাছ ধরতে চলুন আমার সঙ্গে। ফিরবার পথে শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর জৈনমন্দির দেখবো। আর বৈদ্যুতিক্ রজ্জুপথে উঠে গিয়ে রত্নগিরি শীর্ষে জাপানী বুদ্ধসংঘের বিশ্বশান্তি স্তূপ দেখবো।"

বিকাশবাবুর পীড়াপীড়িতে সুপ্রিয়কে রাজী হতে হয়। তার হৃদয়টা বড্ডো অশান্ত হয়ে উঠেছে। এরই ভেতর ওধারে দরজার পরদাটা দু'বার সরে গেছে। আর উঁকি দিয়েছে সেই কাজল কালো দুটি চোখ। স্থিরদৃষ্টিতে সুপ্রিয়র দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সুপ্রিয়র সমস্ত দেহে এক অদ্ভুত শিহরণ। লাবণ্যর অন্তরের জমানো বরফ কি শেষ পর্যন্ত গল্‌লো?

—"ডাক্তার বারনারড্, বিখ্যাত শল্য-চিকিৎসক, যিনি অসুস্থ হৃদ্‌যন্ত্রের বদলে নূতন হৃদ্‌যন্ত্র দেবার প্রথম কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, একবার বলেছিলেন—হৃদয় হারাও। কিন্তু হৃৎপিণ্ড হারিও না। মানে জেনে-শুনে হৃৎপিণ্ডটি নষ্ট করো না। তা মশাই হৃদয় নিয়ে বেশি নাড়াচাড়া করলেই হৃৎপিণ্ড জখম হবার সম্ভাবনা। ওধার দিয়েই যাবেন না মশাই।" আবার বিকাশবাবু হা-হা করে হেসে ওঠে।

—"আমার কাছে ঢাক্-ঢাক্ গুড়-গুড় বলে কিছু নেই। সব সোজাসুজি বল্‌বো।"

সুপ্রিয় শঙ্কিত হয়ে ওঠে। কি জানি বিকাশবাবু সব কিছু জেনে

ফেল্‌লো নাকি! "জানেন তো হাসি থেকে ভালো ওষুধ নেই মশাই। হাসি আমাদের শরীরের অনুভূতিশীল নার্ভগুলোকে সচেতন করে তোলে। স্নায়ু-দুর্বলতা দূর করে। তাই তো রাতদিন আমি হাসির ধ্যান করি। লাবণ্যকেও সদাসর্বদা হাস্‌তে বলি। লাবণ্য হাসে কম। কিন্তু হাস্‌লে ওকে ভারী ভালো লাগে। ওর মুক্তোর মতো দাঁত। ভারী সুন্দর!"

সুপ্রিয় ভাবে লোকটা সংঘাতিক স্ত্রৈণ। বউ-পাগলা লোক। "আজ উঠি।" বলে সুপ্রিয়। নমস্কার-বিনিময়ের পর সুপ্রিয় ঘর ছাড়ে। ছাড়বার আগে দুটি চোখের সন্ধান করে।

ঝ

রেস্ট্ হাউসে বসে সুপ্রিয় ইতিহাসের পাতা ওল্টাচ্ছিলো। আড়াই হাজার বছরেরও আগে শাক্যমুনি গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন।

সিদ্ধার্থকে সংসারী করবার জন্যে অতি অল্প বয়সে পিতা তাঁকে পরমা এক সুন্দরীর সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। নিযুক্ত করেছিলেন সহস্র সুন্দরীকে সিদ্ধার্থের সহচরীরূপে। ঘুমন্ত সুন্দরীদের দেখে বিকট কুৎসিত কতোগুলো মাংসস্তূপ ছাড়া আর বেশি কিছু তিনি ভাবতে পারলেন না। অশ্রু, স্বেদ, পুরীষ, মূত্র, শোণিত দ্বারা বিকৃত এই দেহ, জরা মৃত্যুর বাসস্থান। সিদ্ধার্থকে মায়ায় আবদ্ধ রাখতে পারলো না। এসব থেকে তাঁর মুক্তি চাই। তাই মুক্তি অন্বেষণে তিনি ছুটেছিলেন।

বিম্বিসারের রাজত্বকালে চিকিৎসক জীবকের নাম অনেক দূরদেশের লোকেরও জানা ছিলো। তাঁর খ্যাতির সীমা-পরিসীমা ছিলো না। মনুষ্যদেহে রোগ নিবারণের উদ্দেশ্যে তখনকার দিনে ছুরি চালিয়ে তিনি যশস্বী হয়েছিলেন। রাজা বিম্বিসারের দেহে তিনি নাকি অস্ত্রোপচার করেছিলেন। বুদ্ধদেবের চিকিৎসা তিনিই করতেন। শোনা যায় বারাণসীর এক ব্যবসায়ীর মস্তকে অস্ত্রোপচার করে তার মস্তিষ্ক থেকে টিউমার দূর করবার চেষ্টায় তিনি সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

সুপ্রিয় ভাবে তার অনেক জায়গা এখনো দেখবার রয়েছে। রাজগীরের শঙ্খলিপি দেখতে হবে। উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে দক্ষিণে বানগঙ্গা যাবার রাস্তায় এটি পড়ে। এখানে পাথরের ওপর অনেকগুলো লিপি উৎকীর্ণ রয়েছে। প্রায় ২৯টি পূর্ণ ও ভগ্ন লিপির চিহ্ন রয়েছে। এর পাঠোদ্ধার এখনো সম্ভব হয়নি।

অনেকের মতে লিপিগুলো মহাভারতের যুগের। কেউ কেউ বলেন যে, এই স্থানেই ভীম ও জরাসন্ধের মল্লযুদ্ধ হয়। কয়েক জায়গায় গর্তের মতো যে দাগ দেখা যায় তা নাকি ভীম এবং জরাসন্ধর হাত, পা ও হাঁটুর দাগ। বিম্বিসার নাকি এইখানেই বুদ্ধের প্রথম দর্শন লাভ করেন।

সুপ্রিয়কে একবার গৃধ্রকুট পাহাড়ে যেতে হবে। প্রথম গুহাটির নাম কাশ্যপায়ন গুহা। এখানে নাকি ভগবান বুদ্ধদেব নিজের বস্ত্র শুকোতেন। গৃধ্রকুটে বিম্বিসার বসে বুদ্ধদেবের উপদেশবাণী শুনতেন। সুপ্রিয়কে যেতে হবে পিপল্ গুহায়। কিছু পালি গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, প্রসিদ্ধ ভিক্ষু মহাকাশ্যপ্ এই স্থানে বাস করতেন।

রাজগীর জৈনদের বহু প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র। এখানে খৃস্ট-পূর্ব ১,০০০ বছর আগে থেকে খৃস্ট-অব্দ ১৫০৪ শতাব্দী পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত মূর্তি সকল রয়েছে। রাজগীর থেকে বাইশ মাইল দূরে পাওয়াপুরী জৈনদের তীর্থস্থান। জৈনধর্মের প্রবর্তক চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্কর ভগবান মহাবীর এখানে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। নালন্দা রাজগীরের ৮ মাইল উত্তরে অবস্থিত। প্রাচীন ভারতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্র বলে বিখ্যাত ছিলো।

সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে প্রখ্যাত চীনাপণ্ডিত ও পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ এখানে জ্ঞানচর্চার জন্যে আসেন। শীলভদ্র ঐ সময়ে নালন্দার প্রধান আচার্য ছিলেন। দশ হাজার ছাত্র ও দেড় হাজার অধ্যাপক এখানে থাক্‌তো। নালন্দা ছিলো আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। দ্বিতীয় শতাব্দীর বিখ্যাত দার্শনিক এবং রসায়নশাস্ত্র বিশারদ আচার্য নাগর্জুন নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন।

ইতিহাস। শুধু ইতিহাস। বিম্বিসার পুত্র অজাতশত্রু পিতাকে হত্যা করে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিম্বিসার একদিন তাঁর মহিষীকে বলেছিলেন—"আজ এ বেনুবনে আচ্ছাদিত কাননে

প্রার্থনা করো মহিয়সী সম্রাজ্ঞী। ঐশ্বর্য, বৈভব সব মোর করায়ত্ত। নূতন নগরী এক আমি করিবো সৃষ্টি। যুদ্ধ নয়। রক্তস্রোত নয়। ধ্বংস নয়। গাহিবে সবে মিলি রাজগৃহের জয়। গিরিব্রজ, বসুমতী, বৃহদ্রথপুর, কুশাগ্রপুর, পুরাতন রাজগৃহ হবে ম্লান। নব রাজগৃহের করিবো সৃষ্টি আমি। জানো মহিষী দেখিলাম এক অপূর্ব স্বপ্ন। দেখিলাম আসিতেছে পুত্র তোমার। ঐশ্বর্য বীর্যে পরাক্রমশালী। গতিপথ দ্যুতিমান্। সপ্ত অশ্ব টানিছে যে রথ পুত্র তোমার আরোহণ করিয়াছে তাতে। বিচিত্র। অদ্ভুত। পুত্র মোর আমা চেয়ে বহু গুণে বৈভবশালী। পরাক্রমশালী। তাহারই খ্যাতির দ্যুতিতে ম্লান হবে গরিমা আমার। জানো প্রিয়তমে, বসুন্ধরা আর থাকিবে না অনুর্বরা। হবে বুঝি সঞ্জিবীতা। ফল্গুধারা যেমতি মেটায় তৃষ্ণা বসুন্ধরার। প্রথম বর্ষণে তৃষিত চাতকের যেমতি হয় পিপাসার অবসান। তেমতি শান্ত হবে পিপাসা তোমার। কামাগ্নি অনলে পুড়ে মরে সতী কিসের আশায়? মাতৃদন্ত উচ্চশির তোলে কিসের ভরসায়? বংশের গরিমা কে বাড়াবে তিল তিল করে চন্দ্রকলা সম? তুমি যে রত্ন করিবে লাভ, মুক্তা, প্রবাল, ইন্দ্রনীল, সব কিছু তার কাছে হবে ম্লান।"

মহাভারতের সভাপর্বে রয়েছে কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন জরাসন্ধ বধের উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মণের বেশ ধরে মগধ যাত্রা করলেন। তাঁরা কুরুজাঙ্গলের ভেতর দিয়ে গিয়ে কালকূট দেশ অতিক্রম করে, গণ্ডকী, মহাশোণ, সদানীরা, সরযূ, চর্মন্বতী প্রভৃতি নদী পার হয়ে মিথিলায় এলেন। তারপর পূর্বমুখে গঙ্গা ও শোণ অতিক্রম করে মগধ দেশে প্রবেশ করলেন এবং গিরিব্রজ নগরের প্রান্তস্থ মনোরম চৈত্যক্ পর্বতে উপস্থিত হলেন। এইস্থানে রাজা বৃহদ্রথ এক বৃষরূপধারী মাংসাশী দৈত্যকে বধ করেন এবং তার চর্ম আর নাড়ী দিয়ে তিনটি ভেরী প্রস্তুত করে স্থাপন করেন। কৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুন সেই ভেরী ভেঙে ফেলে পর্বতের এক বিশাল প্রাচীন শৃঙ্গ উৎপাটিত করে নগরে প্রবেশ করলেন।

জরাসন্ধ বধের পর পুত্র সহদেব তার পুরোহিত, অমাত্য ও স্বজন-বর্গের সঙ্গে এসে বাসুদেবকে কৃতাঞ্জলীপুটে প্রণাম করলেন। কৃষ্ণ তাঁকে অভয় দিয়ে তাঁর প্রদত্ত মহার্ঘ রত্নসমূহ নিলেন এবং তাঁকে মগধের রাজপদে অভিষিক্ত করলেন।

সুপ্রিয় ইতিহাসের পাতা থেকে চোখ তুল্তেই দেখতে পেলো সাত নম্বর কামরার পাশ থেকে টুন্টুন্ প্রসাদ সরে গেলো। চালু ছেলে এই টুন্‌টুন্ প্রসাদ। রেস্ট্ হাউসের রক্ষণাবেক্ষণের ভার তার উপর।

একটা অল্প পাওয়ারের বাল্ব থেকে আলো ঠিক্‌রে পড়ছিলো। তারই আলোতে দেখা গেলো একটা সুগোল ফরসা ধব্‌ধবে হাত টুন্‌টুন্ প্রসাদের হাতে ধরা রয়েছে। মেয়েটার ঢিলেঢালা পোশাক। বুকের বর্তুলাকার মাংস অর্ধেকটা বেরিয়ে আছে। বাইরে থক্‌থকে অন্ধকার, মেঘের গর্জন, হাওয়ার মত্ততা, বিদ্যুতের ঝিলিক্—অবুঝ কান্নায় আকাশটা ভেঙে পড়ছে। টুন্টুন্ প্রসাদের মিশ্-মিশে কালো শরীর। লোমশ কালো দু'খানা হাত। মেয়েটা চট্ করে দরজার আড়ালে সরে গেলো। না, সুপ্রিয় দেখতে ভুল করেনি। বিকাশবাবুর ষোলো বছরের মেয়েটা। সর্বনাশ! মেয়েটা কি বিকার-গ্রস্ত? এ বিকৃত রুচিসম্পন্ন দুটি নরনারীর প্রেম দেখবার জন্যে সুপ্রিয় প্রস্তুত ছিলো না। গোটা রেস্ট্ হাউসে মেয়েটার প্রেম করবার কি অন্য কেউ ছিলো না? এ মোহ কেন? অতো সুন্দর মেয়েটার রুচির এ অবনতি কেন? এ দুর্দ্দশা কেন? নারী হৃদয়ের গোপন খবর দেবতারাও রাখেন না। পুরুষ তো কোন্ ছার! রামধনুকের মতো মনের আকাশে ক্ষণে ক্ষণে রং বদলায়। রূপ রস গন্ধের জন্যে প্রাণ বুঝি আকুলি-বিকুলি করে। রেস্ট্ হাউসে ক্ষণে ক্ষণে পাওয়ার ফেইলিওর। ক্ষণে ক্ষণে আলো নিভে যাচ্ছে। এ যেন অপ্রদীপের মহড়া। আবার যখন আলো জ্বলে, তখন টিম্‌টিম্ করে।

গতরাত্রে সুপ্রিয় এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছে। সাত নম্বর ঘরের পাশে সে টুন্‌টুন্ প্রসাদকে দেখেছিলো। টুনটুন্ প্রসাদের চোখ-

মুখে কেমন একটা বিহ্বল ভাব লেপ্‌টে ছিলো। হাবভাবে ছিলো সঙ্কোচ, জড়তা আর শঙ্কা। সাত নম্বর ঘরের পাশে বাথরুমের ভেতর টুনটুন্ প্রসাদ নীচু হয়ে কি যেন করছিলো। সুপ্রিয় কৌতূহলের ডানায় ভর করে এগিয়ে গিয়েছিলো। যা সে দেখ্‌লো, নিজের চোখকে সুপ্রিয় বিশ্বাস করতে পারেনি। টুনটুন্ প্রসাদ একটা শাড়ি বার বার শুঁক্‌ছিলো। ছয় নম্বর ঘরে এক দম্পতি এসে উঠেছে। বউটার বয়স বিশ-বাইশের বেশি হবে না। মানুষ গন্ধ-বিলাসী। গন্ধ নাসারন্ধ্রের মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে পদার্থের গন্ধের অনুভূতি জানায়। গন্ধ যৌন আবেদন আনে। সুপ্রিয় টুন্‌টুন্ প্রসাদকে চেপে ধরেছিলো।—"তোর বউ রয়েছে না? বউ-এর কাছে যাস্‌নে কেন?"

টুন্‌টুন্ প্রসাদ ততোক্ষণে সঙ্কোচ, শঙ্কা, বিহ্বলতা ঝেড়ে ফেলেছে। পরিষ্কার কণ্ঠে সে জানিয়ে দিলো যে, বউ-এর মোকাবিলা করবার হিম্মত্ টুন্‌টুন্ প্রসাদের নেই। ওর মতে, ওর বউ আবার মেয়েছেলে নাকি! আস্ত মরদ। শক্ত আর ভারী মজবুত। সাংঘাতিক ধরনের জাঁদরেল। মাঝে মাঝে মদ-মাংস খেয়ে খুনখারাপী করতে চায়। তার কথা না শুন্‌লে, অসতর্ক হলে খেসারত দিতে হবে বৈকি! তখন আবেদন-নিবেদন সব নাকচ হবে। সমস্ত কিছু বানচাল করে ছাড়বে। বরদাস্ত করবে না মোটেই। আজ সপ্তাহ তিনেক সে বউয়ের কাছে যায়নি। বউ তাকে গ্রাহ্য করে না মোটেও। রেস্ট্ হাউস থেকে মাইল পনেরো দূরে বউ থাকে।

বউ তার পরোয়া করে নাকি! যাকে ইচ্ছে বিছানায় জোর করে শুইয়ে দেয়। নিজে পাশে শোয়। আমোদ-আহ্লাদ করে। সুখ-শান্তিতে মজে যায়। রেস্ট্ হাউসের রান্নাঘর থেকে ভালো-মন্দটা কুড়িয়ে কাচিয়ে সে বউকে দিয়ে আসে। তাতেই বউ খুশি থাকে। খেয়ে খেয়ে বউটার তাগদ্ বেড়ে গেছে।

সরল বিশ্বাসে টুন্‌টুন্ প্রসাদ সব কিছু বলে। সুপ্রিয় ভাবে টুন্‌টুন্ প্রসাদটা কি মানুষ! বউ-এর খবরদারি করে না। অন্য

পুরুষকে তার বিবি পাশে শোয়ায় তাতে ত
নেই। .রেস্ট্ হাউসে খানিকটা ফষ্টি-নষ্টি করেই ৻
শু঳কে, ব্লাউজ হাতড়িয়ে তার যৌন আকাঙ্ক্ষা সে মেটা঩

টুন্‌টুন্ প্রসাদ রেস্ট্ হাউসের দেখাশুনো করে। টুন্‌টুন্ প্র-- কাছে সব ঘরের চাবি। বোর্ডারদের ভেতর কেউ থাকে চারদিন, কেউ এক সপ্তাহ। কেউ আবার চার সপ্তাহ। ঘরে ঘরের ফুট্‌ফরমাস্ সে হাসিমুখে খাট্‌ছে। মাঝে-মধ্যে সে কিশোরীর হাতে কাঁচের চুড়ি গুঁজে দেয়। বধূর আল্‌তা যোগাড় করে এনে দেয়। বারান্দার অন্ধকারে নুয়ে পড়া বুড়ীর হাতে আফিং-এর গুলি গুঁজে দেয়। পরিশ্রমের বদলে কি নেয় কে জানে। এই মুহূর্তে পাকড়াশী বোনের ওষুধ আন্‌তে ছোটে টুন্‌টুন্ প্রসাদ। এগারো নম্বর ঘরে মিস্ পাকড়াশী তার পঁয়তাল্লিশ বছরের ছোট বোনকে প্রশ্ন করছে—"কি বল্‌ছে রে ডাক্তার ?

—"ডাক্তার বল্‌লো চিন্তার কোনো কারণ নেই। তুমি মাসখানেকের ভেতর সেরে উঠ্‌বে। আর তুমি সেরে উঠ্‌লেই আমরা ভারত-ভ্রমণে বেরিয়ে পড়বো।" সুপ্রিয় শুনেছে এ দুরারোগ্য ক্যান্‌সার। ডাক্তার নাকি আশা ছেড়ে দিয়েছে। অথচ ছোট বোন বড় বোনের কাছে সমস্ত কিছু গোপন করছে।

—"সুমি, তোর বাড়ি তৈরীর কাজ কতোদূর এগুলো রে ?"

ছোট বোন জবাব দেয়—"কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।" দুই বোন। দু'জনেই অবিবাহিতা। বড় বোনের বয়স পঞ্চাশ ঊর্ধ্বে, ছোট পঁয়তাল্লিশ। দু'জন দু'জনকে জড়িয়ে রয়েছে। ওরা মিলে-মিশে আছে। একজনের সুখ হলে অন্য জনের সুখ হয়। দুঃখ হলে দুঃখ। দু'জনেই শিক্ষয়িত্রী। ওদের প্রীতি প্রেমের মধ্য দিয়ে কোনো পুরুষমানুষ কোনোদিন উঁকি-ঝুঁকি দিতে পারলো না। নিরেট পাথরের দেয়াল।

—"আমার ঘরটা কেমন হয়েছে রে ?" বড় বোন ছোট বোনকে প্রশ্ন করে।

।” ছোট বোন বাড়ি বানাচ্ছে। ওদের ইচ্ছে
নে একসঙ্গে বসবাস করবে।

পার রঙ কি হবে তা আমি বলে দেবো।” দিদি বলে।

—“তা দিও দিদি। তুমি এখন ঘুমোও।”

—“আমার ঘরের দেয়ালের কালার কি হবে তোর খেয়াল আছে?”

—“আছে। সবুজ। বাড়ি যে বানাচ্ছে তাকে সব বলে দিয়েছি।”

—“জানিস সুমি, বাথরুমটা খুব সুন্দর হওয়া চাই, বাথরুমটা খুব ভালো না হলে কিছুতে আমার মন ভরবে না।”

—“তুমি কোনো চিন্তা করো না দিদি। বাথরুমের ভার আমার ওপর ছেড়ে দাও।”

—“তোর কি মনে হয়, মাস দেড়েকের ভেতর নতুন বাড়িতে গিয়ে উঠতে পারবো না?”

—“পারবো বলেই তো মনে হচ্ছে দিদি। তুমি ঘুমোও দিদি। তোমার মাথায় আমি হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।” সুপ্রিয় জানে সুমিতা দিদিকে মিথ্যে প্রবোধ দিচ্ছে। সে স্পষ্ট দেখতে পেলো, ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সুমিতা বারান্দায় দাঁড়িয়েছে। তার চোখ থেকে জলের ধারা নেমে এসেছে। সুমিতা কাঁদ্‌ছিলো। দিদি ছাড়া তার আর কেউ নেই।

একফাঁকে বিকাশবাবু এসে সুমিতার কাছে দাঁড়ায়। সুমিতার সঙ্গে দুটো সুখ-দুঃখের কথা বল্‌তে চায়। কথার মাধ্যমে আতালি-পাতালি সুমিতার মনটা খুঁজতে চায়। অন্তঃকরণে খানিকটা তুফান তুল্‌তে পারে কিনা সে চেষ্টা করে দেখে। সুমিতা কথাবার্তা বলে। শোনে সবকিছু। মনের দরজা-জানালা সব ভালো করে বন্ধ করে তবে সে এগোয়। কথাবার্তা বলে। পুরুষমানুষ সম্বন্ধে কোনো দুর্বলতার প্রশ্রয় সে দেবে না। কারণ কি কেউ জানে না। দু'বোনই কি চোট খেয়েছে? অন্তঃকরণে কোনো সময়ে দাগা

লেগেছে ? নাকি পরস্পরের আকর্ষণের কাছে পুরুষমানুষ সম্বন্ধে দুর্বলতা কিছুই নয় ? বিকাশবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লেক্‌চার ঝাড়্‌ছে। ওকে বলেছিলো বোনকে প্রোটিন্ জাতীয় খাবার না দিতে। ক্যান্‌সার রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রোটিন্ জাতীয় খাবারের ব্যাপারে যদি সচেতন হয়ে চলে তবে তাদের রোগ-যন্ত্রণার কিছুটা লাঘব হওয়া সম্ভব। যদি কেউ ক্যান্‌সার রোগী হয় তাহলে তার দৈনিক্ খাদ্য-তালিকা থেকে প্রোটিনের পরিমাণ কমিয়ে ফেলে রোগ প্রতিরোধ করার ব্যাপারটা সহজতর হয়। রোগ-যন্ত্রণার কিছুটা উপশমও হয়।

টুন্‌টুন্ প্রসাদ বারো নম্বর কামরার পাশে সরে এসেছে। রেস্ট্ হাউসে আজ রাতের খাবার পাওয়া যাবে না। ঠাকুর চাকর সবাই অসুস্থ। যার যার নিজের ব্যবস্থা করতে হবে। সুপ্রিয় টুন্‌টুন্‌কে ডাকে—"আমার খাবারের বন্দোবস্ত করতে পারিস্ টুন্‌টুন্ ?"

—"কি খাবেন বাবু ?"

—"শাক-শব্‌জী, মাছ, ডিম, রুটি ভাত, যা জোটাতে পারিস্।"

—"পয়সা দিলে বাজার থেকে নিয়ে আস্‌তে পারি। বাজারের কাছে দোকান রয়েছে। কাছে-পিঠে খাবারের দোকান নেই।"

—"বেশ, নিয়ে আয়।" সুপ্রিয় একটা পাঁচটাকার নোট টুন্‌টুন্ প্রসাদের হাতে গুঁজে দেয়। অন্ধকারে টুন্‌টুন্ প্রসাদের চোখদুটো জ্বলে ওঠে। সুপ্রিয় ভালো করেই জানে যে, টুন্‌টুন্ প্রসাদ হোটেল বা রেঁস্তোরা থেকে খাবার আনবে না। রেস্ট্ হাউসের উঠোন আর বাগান পার হলেই অনেকগুলো বাঁশের ঘর রয়েছে। চারদিকটা আগাছা আর জঙ্গলে ভর্তি। সেখানেই কোনো একটা ঘরে বসে টুন্‌টুন্ প্রসাদ স্বহস্তে রান্না করবে। খাবারের কিছুটা নিজের জন্যে রেখে বাকীটা সাহেবকে এনে দেবে। টাকা দেড়েক সে খরচ করবে। বাকী সাড়ে তিনটাকা কোমরে গুঁজবে। খাবার যা দেবে তা গরুরও অখাদ্য। সাহেব খাবার সম্বন্ধে আপত্তি তুল্‌লে সে রেঁস্তোরার উদ্দেশ্যে খিস্তি-খেউড়ের ঢেউ তুল্‌বে। আপন মনে পাজীগুলোর বিরুদ্ধে

অশ্রাব্য গালিগালাজ করবে। সুপ্রিয় পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে সমস্ত কিছু জানে। কিন্তু তবু উপায় নেই। আজ রেস্ট্ হাউসে রাতের খাওয়া জুটবে না। এসময়ে রেস্ট্ হাউসের বাইরে পা বাড়াতেও আর ইচ্ছে করছে না। সুতরাং টুন্‌টুন্ প্রসাদের ওপর ভরসা করা ছাড়া আর উপায় কি!

রাত গভীর। দরজায় করাঘাত শুনে সুপ্রিয় বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। দরজা সে খুলে দিলো। কিন্তু একি! সুপ্রিয় প্রায় মূর্চ্ছিত হবার উপক্রম। লাবণ্য দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু একি অবস্থা লাবণ্যর! বক্ষাবরণ রহিত। উন্মুক্তবক্ষা, উদ্ভিন্নযৌবনা নারী। কোমর থেকে সূক্ষ্মতম রাত্রিবাস ঝুল্‌ছে। গোটা শরীরে প্রাচুর্যের প্রতিশ্রুতি। ছিঃ ছিঃ! সুপ্রিয় দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাতে বাধ্য হয়। লাবণ্যর এ অধঃপতনের জন্যে সুপ্রিয় প্রস্তুত ছিল না। লাবণ্য যেন মোহাবিষ্টা। তার দৃষ্টি কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত। লাবণ্য কি উন্মাদ? না কি কামে জর্জরিতা নারী?

প্রেমের খেলায় কি ভালো করেই মেতেছে লাবণ্য? মনে হয় লাবণ্য সোজা বিছানা ছেড়ে চলে এসেছে। সুপ্রিয় ভাবে, লাবণ্যর মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করে দেবে নাকি? ছিঃ ছিঃ! রেস্ট্ হাউসের বাদবাকী লোক যদি দেখে ফেলে! কি ভাববে! লাবণ্যর স্বামী বিকাশবাবু যদি এই মুহূর্তে এখানে চলে আসে! ষোলো বছরের মেয়েটা এসে মার এ অবস্থা যদি দেখে ফেলে! সুপ্রিয় এসব ভাবছে। দরজা বন্ধ করবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে। ঠিক সে সময় বিকাশবাবু এগিয়ে এসে স্ত্রীর কাঁধে হাত রাখে।

—"ঘরে চলো।"

—"এ্যাঁ!" লাবণ্যর কণ্ঠ থেকে নির্গত একটি শব্দ। লাবণ্যর মোহাবস্থা যেন ধীরে ধীরে কাটছে। লাবণ্য ঘুরে দাঁড়ায়। বিকাশবাবু লাবণ্যর এক হাত ধরে। তারপর ওকে নিয়ে নিজ ঘরে চলে যায়। যাবার আগে সুপ্রিয়র সঙ্গে একটা কথাও বলে না।

সমস্ত গল্পটা পরে সুপ্রিয় শুনেছিলো। বিয়ের আগে লাবণ্য একটি ছেলেকে ভালবাস্‌তো। গভীর প্রেম। প্রেমসাগরে যখন দু'জনে ডুবোডুবি করছে, তখন একদিন ছেলেটি বিশেষ প্রয়োজনে, একটা দুরূহ সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে লাবণ্যকে তার ঘরে ডেকেছিলো। লাবণ্য সে ডাকে সাড়া দেয়নি। যায়নি সে। ছেলেটি অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করেছিলো। মনে সে প্রচণ্ড আঘাত পায়। সে ভেবেছিলো লাবণ্যর তার চরিত্রের ওপর অবিশ্বাস রয়েছে। প্রেমিকের মনে ক্ষোভের ঢেউ বইলো। ছেলেটি সুইসাইড্‌ করে জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটালো।

লাবণ্য পাগল হয়ে গিয়েছিলো। সেদিনও ঠিক ওরকম অবস্থায় লাবণ্য বিছানা থেকে উঠে ছেলেটির ঘরে ঢুকেছিলো। ছেলেটি তখন ফাঁসীর দড়ি থেকে ঝুল্‌ছে। বিয়ের পর লাবণ্য ভালো হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ভালো হয়নি। তিন-চার বছর পর-পরই পাগলামীর ভূতটা লাবণ্যর কাঁধে চেপে বসে। ঘুমের ভেতর লাবণ্য অনেক কিছু স্বপ্ন দেখে। বিড় বিড় করে আপনমনে বকে। মোহবিষ্টা হয়ে বিছানা ছাড়ে। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে। শরীরে সায়া, সেমিজ, শাড়ি আছে কি না আছে সে বিষয়ে পরোয়া করে না। সেদিনও প্রায় বস্ত্রবিহীন অবস্থায় লাবণ্য ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে সুপ্রিয়র ঘরে ঢুকতে চেয়েছিলো।

* * *

সে-রাতে টুন্‌টুন্‌ প্রসাদ খাবার দিতে দেরী করছিলো দেখে সুপ্রিয় রেস্ট্‌ হাউসের উঠোন পেরিয়ে বাঁশের ঘরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলো। সুপ্রিয় ভালো করেই জান্‌তো ওখানে টুন্‌টুন্‌ প্রসাদ ভাত-ডাল পাকাচ্ছে। অখাদ্যগুলো প্লেটে সাজাচ্ছে। পাঁচ টাকার ভেতর সাড়ে তিন টাকা সে নিজের জন্যে রাখবে। সুপ্রিয় এগিয়েছিলো বাঁশের ঘরের উদ্দেশ্যে। জায়গাটা আগাছায় ভর্তি। রাশীকৃত জঞ্জাল। আশেপাশে মিশ্‌মিশে কালো আঁধার। বাঁশের ঘরে বোধ করি কুপি জ্বল্‌ছিলো। টিম্‌টিমে আলোর ইঙ্গিত। ঘরের

কাছাকাছি আস্‌তেই একটা গোঙানীর শব্দ বাতাসে ভেসে আসে। কেউ কাত্‌রাচ্ছে।

কৌতূহল চাপ্‌তে না পেরে সুপ্রিয় এগিয়ে বাঁশের ঘরের ফুটো দিয়ে উঁকি দেয়। উঁকি দিয়েই তাজ্জব বনে।

একটা মেয়েছেলে টুন্‌টুন্‌ প্রসাদকে মাটিতে ফেলে তার ওপর চেপে বসে আছে। তার আগে বোধ করি আঁচ্‌ড়িয়ে, কামড়িয়ে চুল টেনে টুন্‌টুন্‌ প্রসাদকে কাহিল করে এনেছিলো। তখন পর্যন্ত মেয়েটা টুন্‌টুন্‌কে ঘন ঘন দংশন করছে। এ আদরের দংশন নয়। টুনটুন্‌ গোঙাচ্ছে। কাতরাচ্ছে। মেয়েটা কোমলা কমনীয়া কোনোটাই নয়। দৈত্যাকৃতি এক নারী। চোয়ালে যার দৃঢ় প্রত্যয়। জ্বলন্ত চোখে ব্যাঘ্রদৃষ্টি। উচ্চতায় পাঁচ ফিট এগারো ইঞ্চির কম নয়। এ যেন ঘটোৎকোচ-জননী হিড়িম্বা। বর্তমান যুগে কুস্তীতে পারদর্শিণী হামিদাবানু। ও মেয়ে নয়। মেয়ের সাজসজ্জার অন্তরালে একটা জোয়ান পুরুষ। সর্বনাশ! এই তবে টুনটুন্‌ প্রসাদের বউ হবে। দু-তিন সপ্তাহ স্বামী দেবতার খোঁজ-খবর না পেয়ে স্বামীকে পিটোতে এসেছে।

সুপ্রিয় জানে মস্তিষ্কে পিটুইটারী গ্ল্যাণ্ড থেকে যে কয় রকম হরমোন্‌ নিঃসৃত হয় তারাই মানবদেহের সকল রকম কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করে। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হরমোন্‌ হলো হিউম্যান্‌ গ্রোথ হরমোন্‌। সংক্ষেপে এইচ জি এইচ। দৈহিক্‌ বৃদ্ধির জন্যে এই হরমোনটি শরীরে কম-বেশি হলে মানুষের চেহারা দৈত্যাকার অথবা বামনের ন্যায় হয়।

আর সুপ্রিয় ভাবে টুনটুন প্রসাদের বউ বোধহয় প্রকৃত নারী নয়। নারীর চেয়ে পুরুষের গুণাবলী ওর ভেতর বেশি। সুপ্রিয় জানে যে, প্ল্যাস্টিক্‌ সার্জারির মাহাত্ম্যে নারী পুরুষে আর পুরুষ নারীতে রূপান্তরিত হতে পারে। কামজর্জরিতা নারীর কবলে পড়ে টুনটুন্‌ প্রসাদের ভোগ করতে হয়েছিল অশেষ নিগ্রহ।

যাক্‌, সে-রাতে সুপ্রিয়র অদৃষ্টে আর অন্ন জোটেনি।

এঃ

জৈনধর্মের বিংশতি তীর্থঙ্কর মুনি সুব্রত রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। চতুর্বিংশতি এবং অন্তিম তীর্থঙ্কর ভগবান মহাবীর চতুর্দশ বর্ষাঋতু রাজগৃহে কাটিয়েছেন। রাজগৃহের বিভিন্ন পাহাড়ের ওপর তাঁর সর্বপ্রধান এগারজন শিষ্য নির্বাণ লাভ করেন। রাজগীরে নাকি ২৫টি জৈনমন্দির রয়েছে।

বৈভার-পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে যে গুহা তাকে শোন্-ভাণ্ডার বলে। সাধারণ লোকের ধারণা যে, এই স্থানে জরাসন্ধের ধনাগার ছিল।

বৈভার পাহাড়ের মাইল খানেক দূরে পূর্ব বাঙ্‌লা থেকে আগত শরণার্থীদের শিবিরের আশেপাশে সুপ্রিয় ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। সিনেমা কোম্পানীর নির্দেশ অনুযায়ী একটা গল্পের প্লটের জন্যে সুপ্রিয় চারধার হাত্‌ড়িয়ে মরছিলো।

স্বাধীন বাঙ্‌লাদেশের স্বপ্ন সার্থক হয়েছে। শরণার্থীরা দলে দলে ঘরে ফিরছে। সত্যের, ন্যায়ের জয় হয়েছে। যুগে যুগে চিরদিন যা হয়ে এসেছে। নারীর দেহে যে যখন হাত তুলেছে পরিত্রাণ পায়নি সে। ধ্বংস তার অনিবার্য। রাবণ রাজার কি হাল হয়েছিলো! স্বর্ণলঙ্কা পুড়ে ছাই। দুর্যোধন দুঃশাসনের কি ভয়াবহ পরিণতি! ট্রয়ের ইতিহাস সবাই জানে। আজকে চেয়ে ত্যাখো ইয়াহিয়া খাঁকে।

শরণার্থীদের তাঁবুর পাশে দাঁড়িয়ে সুপ্রিয় অনেক কিছু ভেবে যাচ্ছিলো। শরণার্থী তাঁবুগুলো প্রায় ফাঁকা। লোকটা এসে সুপ্রিয়র পাশে দাঁড়ালো। বদ্ধ পাগল। চোখে-মুখে বংশমর্যাদার ছাপ থাকলে কি হয়; দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। তেলবিহীন চুলে জট পাকিয়েছে। লোকটা কখনো হাস্‌ছে। কখনো কাঁদছে।

সুপ্রিয়কে দেখে বিচিত্র অঙ্গ-ভঙ্গী করলে। খানিকটা নাচলে। শরণার্থী শিবিরের রিলিফবাবুর চাপরাশী এসে দাঁড়ালো। সে বল্‌লে —"বাবু, ও লোকটা লেখাপড়া জানা ভালো ঘরের ছেলে। বাঙ্‌লা দেশে ডাক্‌দর ছিলো। হঠাৎ মাথা খারাপ হয়ে এ অবস্থা। রাজগীরের পথে পথে ঘুরে বেড়ায়।

—"তাই নাকি?" সুপ্রিয়র কৌতূহল হলো। সুপ্রিয় বল্‌লে— "ওর সম্বন্ধে জানো কিছু?"

—"রিলিফবাবু জানেন। রিলিফবাবুর ডায়েরীর পাতায় সবকিছু লেখা রয়েছে।" গল্পের গন্ধ পেয়ে সুপ্রিয় ছুট্‌লো রিলিফবাবুর কাছে। রিলিফবাবু সুপ্রিয়কে সাদর অর্ভ্যথনা জানালো। রিলিফবাবু তার ডায়েরীর পাতা খুলে ধরলো।

বাঙ্‌লাদেশ পুড়ছে। পুড়ছে শহর, বন্দর, গ্রাম, মহকুমা। লোকদের মনমেজাজ জ্বল্‌ছে। চোখ থেকে ঝরছে আগুন। ক্ষণে ক্ষণে মৃত্যুর সঙ্গে হচ্ছে কোলাকুলি। বাতাসে শুধু বারুদ আর গলিত দেহের পচা গন্ধ। আমাদের ডাক্তার বউ ঝি ছেলেপুলে নিয়ে পালাচ্ছিলো। নরক থেকে স্বর্গে পালাচ্ছিলো। যাচ্ছিলো শ্মশান থেকে লোকালয়ে। ওদের ধরলে খান্‌-সেনারা। বেয়নেট্‌ দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করবার ব্যবস্থা করেছিলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি ভাবলে কে জানে! জান্‌ নেবে না। ওদের সঙ্গের যুবতী মেয়েটাকে খান্‌দের হাতে তুলে দিলে মিল্‌বে ওদের মুক্তি। চারটে খান্‌-সেনা সপ্রশংস দৃষ্টি মেলে ধরে মেয়েটার দিকে। মাংস-তালের গুণাগুণ যাচাই করে। গোটা পরিবার একদিকে। অন্যদিকে একটি মেয়ে। সমস্যা গুরুতর। ডাক্তার কিছুতেই মেয়ে রেখে যাবে না। কিন্তু ওদিকে গোটা পরিবারটা নির্মূল হবে। খালি দ্বন্দ্ব আর সংশয়। গোটা দলটার ভেতর মতভেদ হতে সুরু করলো। মনের দেয়ালে সংসারের ঝাপ্‌টায় ফাট্‌ল ধরলো। সবাই কি আর হাস্‌তে হাস্‌তে প্রাণ বিসর্জন দিতে রাজী হয়? ডাক্তারকে বাধ্য হয়ে রাজী হতে হয়। খান্‌-সেনাদের ডেকে সে জানালো যে, সে

মেয়ে ছেড়ে চলে যেতে প্রস্তুত আছে। কিন্তু একটা মুস্কিল বাধা দিচ্ছে। মেয়েটা ওদের চলে যেতে দেখলে কেঁদে-কেটে চেঁচিয়ে একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটাবে। তার চেয়ে ডাক্তার যাবার আগে মেয়েটার অঙ্গে ছুঁচ ফুটিয়ে যেতে চায়। ইন্‌জেক্‌শানের গুণে মেয়েটা ঘণ্টা-তুই ঘুমুবে। সেই ফাঁকে ডাক্তার দল নিয়ে পালাবে।

খান্‌-সেনাদের মনে অবিশ্বাসের মেঘ। সংশয়ের দোলা। কাজেই ওদের মনে বিশ্বাস জন্মানোর জন্যে ডাক্তার একটা কুকুরের ওপর ছুঁচ ফোটালে। কুকুর ঘুমিয়ে পড়লো। ঘণ্টাখানেক পরে আবার কুকুরের ঘুম ভাঙ্‌লো। ঘুম ভাঙ্‌তেই ল্যাজ নেড়ে খান্‌-সেনাদের হাত পা হাঁটু চেটে দিলো। খান্‌-সেনারা খুব খুশি। কুকুরটার পিঠ চাপ্‌ড়িয়ে বল্‌লে—"সাবাস!" ওদের সবকিছু বিশ্বাস হলো। ওরা ভাবলে ডাক্তার সম্ভবত ধাপ্পা দিচ্ছে না। ডাক্তারের যুক্তি ওরা মেনে নিলো। ডাক্তার মেয়েটার শরীরে সুঁচ ফোটালে! মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়লো। পড়ে রইলো তার অসাড় নিস্তেজ দেহটা। চোখের জল মুছতে মুছতে ডাক্তার পরিবারের অন্য সবাইকে নিয়ে জীপে উঠ্‌লো।

খান্‌-সেনারা জবরদস্ত জোয়ান। তারা কথার খেলাপ করতে রাজী নয়। জীপে তুলে ওদেরকে তারা বর্ডার পার করে দিলে। কিন্তু কি ছুঁচই ডাক্তার মেয়েটার শরীরে ফুটিয়েছিলো! মেয়েটার ও ঘুম আর কোনোদিন ভাঙ্‌লো না। খান্‌-সেনারা মেয়েটার হিমশীতল, মরে কাঠ হয়ে যাওয়া দেহটাকে টেনে হিঁচ্‌ড়ে নাজেহাল হয়ে শেষে চেঁচিয়ে উঠলো।

ডাক্তারের উদ্দেশ্যে বললে—"বেয়াকুব! বেতমিজ! কুত্তাকা বাচ্চা!" তা একটি গেছে যাক্। হাতে আরো মেয়ে রয়েছে।

তারপর থেকেই ডাক্তার উন্মাদ। মেয়েটা ডাক্তারের বড্ডো প্রিয় ছিলো। ডাক্তার মনে মনে বলেছিলো—"তোকে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম। এবার অন্যদের ঘুম ভাঙার পালা।"

ডায়েরী থেকে সুপ্রিয় মুখ তুলেছে। দূর ছাই! ছ্যাখো দেখি সমস্ত ডায়েরীর পাতা চোখের জল পড়ে কি হয়ে গেছে! সব লেখা ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে!

সুপ্রিয় তাকিয়ে দেখ্‌লো বৈভার পাহাড়ের পেছনে সূর্য অস্ত যাচ্ছে।

ট

রাজগীরে এবার অসম্ভব লোকের ভীড়। লোক আর লোক। সর্বত্র যেন মেলার আবহাওয়া। লোকজনের হাঁক্‌ডাকে সারাটা তল্লাট গম্‌গম্‌ করছে। এক কথায় জম্‌জমাট অবস্থা। সড়কে সড়কে ব্যাণ্ড নয়তো ভেঁপু আর ঢাক্‌ঢোল বাজছে। নির্জন প্রান্তরে সন্ধ্যের পর হ্যাজাক্‌ জ্বল্‌ছে। কাগজের শিক্‌লী, বেলুন আর পতাকা উড়ছে ফর্‌ ফর্‌ করে।

গত চার-পাঁচ বছরের পর এবার লোকজনের ভীড়টা যেন অত্যন্ত বেশি বলেই মনে হচ্ছে। কয়েকটা বছর রাজগীর যেন ঝিমোচ্ছিলো। ট্যুরিস্টরা কয়েকটা বছর যেন সযত্নে রাজগীরকে এড়িয়ে চলাফেরা করছিলো। কুণ্ডের জলের প্রলোভন, পঙ্গু, বাত-ব্যাধিগ্রস্ত লোকেরা যেন ভুলেছিলো। পুণ্যালোভী যাত্রীদের সংখ্যা ছিলো নিতান্ত নগণ্য। কিন্তু আজ কিছুদিন ধরে একি অসম্ভব জনস্ফীতি! সর্বত্র একটা ব্যস্ততা আর ত্রস্ততা। এক ঘুমন্ত পুরী যেন অকস্মাৎ জেগে উঠেছে। কলকোলাহলমুখর নগরী। আলাপ, আলোচনা, গুঞ্জনে মুখরিত। ঝিমিয়ে পড়া, ঘুণে ধরা নির্জীব শহরটায় যেন নতুন প্রাণের জোয়ার এসেছে।

যে হোটেল, রেঁস্তোরা আর বোর্ডিং-হাউসে তীর্থযাত্রী আর পর্যটকদের ভীড় ছিলো নেহাতই মামুলী, সে সব স্থানে তিল-ধারণের জায়গা নেই। "ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই, ভরা এ তরী।" হোটেল, বোর্ডিং-হাউসের কর্মকর্তাদের মুখে ঐ এক বুলি! গোবর্ধনবাবুর "নব নিকেতন" বোর্ডিং-হাউসের ঐ একই অবস্থা। ফুলে ফেঁপে একাকার। বোর্ডিং-হাউসের সর্বত্র লোক যেন কিল্‌বিল্‌ কিল্‌বিল্‌ করছে। ঘরে স্থান হয়নি। প্রকাণ্ড উঠোনে ত্রিপল্‌ টানিয়ে ব্যবস্থা হয়েছে। তাতেও কুলিয়ে ওঠা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।

সামনের খোলা মাঠে সারি সারি ক্যাম্প খাটিয়ে থাকা-খাওয়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

দিনমজুরীতে বেশ কিছুসংখ্যক নতুন লোককে নিয়োগ করা হয়েছে। গোবর্ধনবাবু সামলিয়ে উঠ্‌তে পারছে না। গোবর্ধনবাবু সদা কর্মলিপ্ত। কখনো তরকারির খোসা ছাড়াচ্ছে। কখনো মাছের আঁশ সাফ করছে। জলের বন্দোবস্ত তাকেই দেখতে হচ্ছে। তদারকির পরও সবকিছু নিজের হাতে করতে হচ্ছে।

আলু, পটল, পেঁয়াজ, ঝিঙের ঘাঁটতি পড়ছে অনবরত। যা রান্না হচ্ছে তাই উড়ে যাচ্ছে।

পটল চচ্চড়ি আর পুঁই তরকারীরই আদর কতো! শাকসব্জী চালডালের জন্যে ঘন-ঘন অর্ডার যাচ্ছে পাটনা, মজঃফরপুর, ছাপ্‌রা আর গয়ায়।

বোর্ডাররা শোবার জায়গা চাইছে না। মাঠে, প্রান্তরে, গাছের তলায়, মন্দিরে, চাতালে, পোড়োবাড়িতে যেখানে যেভাবে হোক্‌ রাতটুকু কাটিয়ে দেবে। তাদের শুধু দরকার একমুঠো অন্নের। পেটটা ভরা থাকলে অন্য কোনো চিন্তা তাদের মনে ঠাঁই পাবে না। দশটা উনুন জ্বালিয়েও গোবর্ধনবাবু সামলিয়ে উঠতে পারছে না।

রাজগীরের ঐতিহ্য টেনেছে প্রচুর ট্যুরিস্টকে। রাজগীরের ভগ্ন জীর্ণ মন্দির, মঠ, মসজিদ, দেবদেউল টেনেছে প্রচুর তীর্থযাত্রীকে। রাজগীরের উষ্ণ জলের কুণ্ডগুলো টেনেছে অনেক ব্যাধিক্লিষ্ট ব্যক্তিকে।

গোবর্ধনবাবুর পাশে বসে সুপ্রিয় কথাবার্তা বলছিলো। গোবর্ধন বলে চলে—"জানেন সুপ্রিয়বাবু, গত পাঁচ বছর ধরে রাজগীর যেন ঘুমোচ্ছিলো। হঠাৎ জেগে উঠেছে। ঠেলা সামলাতে হচ্ছে আমাকে।"

—"শুনেছি আপনি এখানে বহু বছর আগে এসেছিলেন। বাঙালীদের মধ্যে এখন যাঁরা জীবিত আছেন শুনতে পাই তাদের ভেতর আপনিই নাকি সবচেয়ে পুরোনো বাসিন্দে।" বলে সুপ্রিয়।

—"ঠিকই শুনেছেন। কতো বছর আগে এসেছি ঠিক এখন মনে নেই। ধরুন একেবারে বাচ্চা বয়সে। পঞ্চাশ বছর আগে। মোট কথা রাজগীরের এ অঞ্চলটা তখন ছিলো গভীর অরণ্য। পথে পথে নেকড়ের দল ঘুরে বেড়াতো। লোকালয় বলে কিছু ছিলো না। বুনো হাতী জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে লোকালয়ে ঢুকে শুঁড় বাড়িয়ে লোক টেনে নিয়ে পালাতো। থেঁৎলে যাওয়া মনুষ্য-দেহটা হয়তো মাইল কয়েক দূরে পাওয়া যেতো।"

—"রাজগীর আপনার কেমন লাগে?" প্রশ্ন করে সুপ্রিয়।

—"রাজগীর ছেড়ে কোথাও আমি তু'দিনের বেশি তিষ্ঠোতে পারিনে। আপনাদের কলকাতায় গেলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। আমি রাজগীরের জঙ্গলে, পাহাড়ে মাঝে মাঝেই ঘুরে বেড়াই। ঘুরতে ঘুরতে স্বপ্ন দেখি। তু'হাজার আড়াই হাজার বা তারও বেশি আগেকার দিনের সব গল্প-কাহিনী মনের অলি-গলিতে ঘুরে বেড়ায়। মাটি শুঁকলেই অনেক হাজার বছর আগেকার গন্ধ আমার নাকে এসে আমাকে বিভ্রান্ত করে তোলে।"

—"Interesting!" বলে সুপ্রিয়।

—"হ্যাঁ, সত্যি তাই। অরণ্যের গাছগাছালির ভেতর আমি ভেষজ ওষধি খুঁজে বেড়াই। কখনো ভগ্নস্তূপ হাত্‌ড়িয়ে বেড়াই।"

—"হোটেল চালানো ছাড়া দেখছি আপনার অদ্ভুত সব সখ রয়েছে!"

—"হ্যাঁ, তা রয়েছে। এই তীর্থে বহুলোকের আগমন। কুণ্ডে বহু লোকের অবগাহন। ভগ্নস্তূপ, ভগ্নাবশেষের রাশি রাশি ইট-কাঠের ফাঁকে ফাঁকে স্বপ্নের ইমারত গড়ে তুলি। আমি মন্দিরে, মঠে, বৌদ্ধ-বিহারে এক অলৌকিক শক্তির হাতছানি অনুভব করি। তাই তো বোর্ডারদের, পুণ্যলোভাতুর লোকগুলোর ঝুলি হাত্‌ড়িয়ে রাতারাতি তাদের দেউলে করে ছাড়তে আমার কেমন সঙ্কোচ বোধ হয়। মনটা সাড়া দেয় না। তাই তো আমার বোর্ডিং-হাউসের রেট সবচেয়ে কম। সুখ-সুবিধে অন্যান্য হোটেল, বোর্ডিং-হাউস্ থেকে অনেক বেশি।"

গোবর্ধনবাবু কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে রাশীকৃত নোটের তাড়া বাক্সবন্দী করছে। ক্যাশ্‌বাক্স ফুলে-ফেঁপে একাকার। লোকজন খাচ্ছে আর যাবার আগে টাকা ফেল্‌ছে। গোবর্ধনবাবু আড়চোখে চারদিককার পরিস্থিতি ওজন করছে। একদিকে কথা বল্‌ছে। আর অন্যদিকে হাতের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

বাইরে শালবনে মঞ্জরী ধরেছে। কুরুচি ও আতগুী লতায় তেল কুচ্‌কুচে সবুজ পাতার আচ্ছাদন। সড়কে টেম্পো লরীতে গুঁতোগুঁতি। সারবন্দী রিক্‌শা, গরুর গাড়ি আর ঘোড়ার গাড়ি।

—"জানেন মশাই! হুঁশিয়ারী ছেড়ে ছিলাম অনেক আগেই। জান্‌তাম ভোল পাল্‌টাবে। আমার কথা শোনেনি। রেঁস্তোরা, বোর্ডিং-হাউসের মালিকেরা প্রস্তুত ছিলো না। এখন হালে পানি পাচ্ছে না। সবাই এখন বেসামাল।"

—"আপনি কি করে বুঝলেন যে, এ ঢেউ আস্‌বে? লোকজনে রাজগীর ফুলে-ফেঁপে উঠ্‌বে?" প্রশ্ন করে সুপ্রিয়।

মুচ্‌কি হাসে গোবর্ধনবাবু। তারপরে সে বলে—"জ্যোতিষী-বিদ্যা বিশ্বাস করেন মশাই?"

—"ও পর্যন্ত গিয়েছিলেন!" বলে সুপ্রিয়।

—"রাজ্য সামলাতে রাজা, নৃপতি, বাদশা জ্যোতিষীদের শরণাপন্ন হয়েছে। আমি কোন্ ছার!" গোবর্ধনবাবু নড়ে-চড়ে বসে। পরনের লুঙ্গীটাকে টেনেটুনে বিপজ্জনক সীমানার অনেকটা ওপরে উঠিয়ে দেয়। শঙ্কিত বোধ করে সুপ্রিয়। হাতের পাখার বাঁট দিয়ে উলঙ্গ লোমশ পিঠটাকে আচ্ছা করে ঘচর-মচর করে চুল্‌কোয়।

—"জ্যোতিষ শাস্ত্রকে কে বিশ্বাস করে না মশাই? মুখে না না করলেও একটা প্রকাণ্ড বিশ্বাস সারা অন্তর জুড়ে বসে আছে। দেখতেই পাচ্ছেন এ ডেমোক্রেসীর যুগেও মন্ত্রী আর উপমন্ত্রী, রাজা আর প্রজা জ্যোতিষীর ঘরে দৌড়োদৌড়ি করছে। গণতন্ত্রের যুগে, ভোটাভুটির আমলে ওর প্রতাপ এত্তোটুকুনও খর্ব হয়নি। গ্রহের শান্তি-স্বস্ত্যয়ন অপ্রতিহত গতিতেই চলেছে।"

—"তা জ্যোতিষীরা আপনাকে কি বলেছে ?" প্রশ্ন করে সুপ্রিয়।

—"বলেছিলো আমাদের মানে হোটেল, বোর্ডিং-হাউসের মালিকদের সুদিন আস্‌ছে। রাজগীর জনতার চাপে ফেটে পড়বে। হোটেল ব্যবসা ফলাও হয়ে উঠবে।" গোবর্ধনবাবু কথা থামিয়ে বোর্ডারদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় মেতে ওঠে। কুশল-বার্তার আদান-প্রদান চলে পরস্পরের ভেতর।

সুপ্রিয় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে গোবর্ধনবাবুকে। পাকাপোক্ত সেয়ানা লোক বল্‌তে যা বোঝায় গোবর্ধনবাবু ঠিক তাই। মুখের ওপর একজোড়া বিরাট গোঁফ। জবরদস্ত জোয়ান, মিশ্‌কালো পুরুষ।

বাইরে দোলনচাঁপা, গুলঞ্চ আর কাঠালচাঁপার বাহার। বৃষ্টি নেমেছে। চারদিকে বৃষ্টির রুপোলি ঝালর।

—"জানেন সুপ্রিয়বাবু! আমার স্ত্রীর পছন্দ ছিলো না এ গোঁফ। গোঁফ কেটে ফেলার জন্যে কি সাধ্য সাধনা!" গোবর্ধনবাবুকে কেমন উদাসীন দেখায়। গোবর্ধনবাবুর মনে আজ সূক্ষ্ম, সুরেলা অনুভূতিগুলো নাড়াচাড়া দিচ্ছে কিনা কে জানে!

—"না মশাই। শুনিনি আমি স্ত্রীর কথা। গোঁফ যথাস্থানে বিরাজমান রইলো। জানিনে স্ত্রী মনের দুঃখে মারা গেলো কিনা! কিন্তু স্ত্রী মারা গেলো।" বেশ সহজ সরলভাবে গোবর্ধনবাবু কথাগুলো বল্‌লে। আবার উল্টো কথাও শোনালে সুপ্রিয়কে।

রাজা সপ্তম লুই নাকি বিয়ে করেছিলো দক্ষিণ ফ্রান্সের এক ডিউকের কন্যাকে। ক্রুশেড্‌ থেকে ফিরে রাজা গোঁফটা ফেল্‌লে কেটে। সঙ্গে সঙ্গে রাণীর প্রচণ্ড রাগ হলো। একদিন সে ঝোঁকের মাথায় ডিভোর্সই করে ফেল্‌লো রাজাকে। পরে বিয়ে করলো ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় হেনরীকে। সূত্রপাত হলো ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে বিরোধের।

—"আপনি স্ত্রী মারা যাবার পর আর বিয়ে করলেন না ?" সুপ্রিয় জিজ্ঞেস করে।

—"না। না মশাই। মেয়েছেলের ব্যাপারে আর নাক গলাই নি। ইচ্ছে করলে একটা কেন, দুটো বিয়ে পর্যন্ত করতে পারতাম। বয়সের কালে চেহারাখানা মন্দ ছিলো না। রাজগীরে এক ম্যাজিস্ট্রেটের মেয়ে আর একবার এখানকার এক এস. ডি. ও.র মেয়ে আমার দিকে এমন ঝুঁকেছিলো যে, প্রায় পা পিছ্‌লে আছাড় খাই আর কি! টাল্‌ সামলিয়ে উঠলাম। ওদিকে নজর দেবার সময় পাইনি। ইচ্ছেও আর ছিলো না। বয়স তখন চল্লিশের ঘরে।"

একটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো। ত্রিশের ঘরে বয়স বলে মনে হলো সুপ্রিয়র। নিম্ন-মধ্যবিত্ত ঘরের। অঙ্গে বিধবার সাজসজ্জা। ডাগর ডাগর চোখদুটো। কেমন লাজুক লাজুক দৃষ্টি। অঙ্গে কাঁচা সোনার দীপ্তি। গোবর্ধনবাবুর কাছে এসে হাত পেতে কি যেন চাইলে। আল্‌গোছে এবং যথেষ্ট সতর্কতার সঙ্গে গোবর্ধনবাবু চাবির গোছা ওর হাতে তুলে দিলে। প্রায় ছুঁড়ে দেওয়ারই মতো।—"খুব সাবধানে তেল-ঘি খরচ করবে। তেল-ঘি নির্দিষ্ট পরিমাণ থেকে বেশি বেশি লাগ্‌ছে। তোমরা সামলাতে না পারলে ভাঁড়ারের ভার আমার নিজ হাতে তুলে নিতে হবে। ভালো চালটা সরিয়ে রেখো।"

মেয়েটি মাথা একপাশে কাৎ করে গোবর্ধনবাবুর নির্দেশের পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে বিদায় নেয়।—"কুণ্ডে নাইতে এসে মা নোটিশ না দিয়েই পরকালের পথে পা বাড়ালে। বিধবা মেয়েটা অথৈ জলে পড়লে। সহায়-সম্বলহীন। আত্মীয়-স্বজনের হদিশ হলো না। না খেয়ে মরবে। কেঁদেকেটে আমার পা ধরলে। ফিরিয়ে দিতে পারলাম না। দিয়েছি ভাঁড়ারের চাবি ওর হাতে। ভাঁড়ারের দেখাশুনো করে। রান্নাঘরের তদারকি করে। তবে মনে হচ্ছে টিক্‌তে পারবে না। সবকিছু খরচ করছে বড্ডো বেশি। ওর নোক্‌রি যাবে।"

—"চাকরিটা খাবেন?" বলে সুপ্রিয়।

—"ওসব ব্যাপারে আমার মায়া-দয়া নেই। আমি নির্মম, নিষ্ঠুর। মেয়েছেলে বলে আমার কাছে রেহাই পাবে না। যৌবন বয়সেই মেয়েছেলেকে ধারে-কাছে ঘেঁষতে দিইনি। প্রেম-ট্রেম

দেখ্‌লেই মেজাজটা তেতে উঠ্‌তো। হ্যাঁ, একটা জিনিস বেশ ভালো বুঝ্‌তাম।" বলে গোবর্ধনবাবু।

—"সেটা কি?" সুপ্রিয়র প্রশ্ন।

—"টাকা, মশাই, টাকা। লেনদেন, হিসেব-নিকেশ, ধার, সুদ। এসব ব্যাপারে মস্তিষ্ক খুব পরিষ্কার ছিলো। ব্যবসাবুদ্ধিতে গোড়া থেকেই পাকাপোক্ত।" একটু থেমে গালে দু'খিলি পান পুরে দিয়ে গোবর্ধনবাবু আবার সুরু করে—"চার্চিল সাহেবের কথা আমার বড্ডো মনঃপূত হয়েছিলো।"

—"কি কথা?"

—"চার্চিল সাহেব বলেছিলেন, প্রেম ও রাজনীতির সহবাস হলে সহমরণ দ্রুত এগিয়ে আসে। আমার বেলায়ও সেক্ষেত্রে বোর্ডিং-হাউসের হতো অপমৃত্যু। তবে একটা কথা সোজাসুজি বলি মশাই। বাইরে বয়সের ছাপ পড়লেও কিন্তু মনের মধ্যে মোহন্‌জাদারোর ধ্বংসস্তূপ নিয়ে বসে থাকিনি। মনের ভেতর অনেক ধরনের সখ বাসা বেঁধেছে। হবি রয়েছে প্রচুর।"

গোবর্ধনবাবু কথা থামিয়ে হিসেবের খাতাটা টেনে নেয়। হিসেবের ওপর চোখ বুলোতে থাকে। এদিক্‌-ওদিক্‌ লোকের আসা-যাওয়ার কম্‌তি নেই। মিনিট পাঁচেক পরে গোবর্ধনবাবু আবার সুরু করে।

—"জানেন মশাই। মাঝে মাঝে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিলের কথা আমাকে শোনায়। আমি যেন কতো বুঝি! তবে পুরোনো মুদ্রার ঝোঁক রয়েছে। ওরই সন্ধানে এদিক্‌-ওদিক্‌ ঘোরাফেরা করি। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দের সঙ্গে মাঝে মধ্যে ঘুরে-ফিরে বেড়াই। ওদের সঙ্গে থেকে শিলালিপির রহস্যভেদের চেষ্টা করি। স্তম্ভলিপির সন্ধান করি। গড়ের ধ্বংসস্তূপের ভেতর কখনো গড়াগড়ি খাই। মাটির গভীর গোপনে হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ি। জঙ্গলের অনন্ত রহস্য আমাকে আকর্ষণ করে।"

গোবর্ধনবাবু থামতেই সুপ্রিয় বলে—"আছেন বেশ।"

—"মাঝে মাঝে শিকারের নেশা রক্তে দোলা দেয়।"

—"শিকারের নেশাও রয়েছে?"

—"তা রয়েছে।" গোবর্ধনবাবু দেয়ালে হেলান দেওয়া বন্দুকটা তুলে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ব্যারেলের ভেতর পাকান দড়ি চালাতে চালাতে কথা বলে।

—"ঐ যে দেয়ালে টাঙানো বাইসনের মাথাটা দেখ্‌ছেন, ওই মাথাটা যে শরীরে অধিষ্ঠিত ছিলো তাকে ছোটনাগপুরের অরণ্যে শিকার করেছিলাম।" গোবর্ধনবাবুর হাতের পাশে উলঙ্গ ভোজালীটা চিক্‌ চিক্‌ করে। ভোজালীটা কেমন যেন একটা হিংস্র দৃষ্টি নিয়ে সুপ্রিয়র দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

—"বয়সের কালে কিনা করেছি! ছোটনাগপুরে, সুবর্ণরেখা আর কোয়েলের ধারে বালিতে সুবর্ণকণিকার সন্ধান চালিয়েছি। সিংভূমের অরণ্যে খনিজ দ্রব্যের সন্ধান করেছি। গোটাশিলা আর বাঘমুণ্ডিতে হীরকখণ্ডের সন্ধান করেছি।"

—"সব দেখেশুনে মনে হয় আপনার এ অঞ্চলে বেশ প্রতিপত্তি রয়েছে!" বলে সুপ্রিয়।

—"তা রয়েছে।" একগাল হেসে জবাব দেয় গোবর্ধনবাবু। —"যৌন অশিষ্টতা আর তার বাড়াবাড়ি আমি খুব অপছন্দ করি। ঠিকাদারের কামিন মেয়েটা গর্ভবতী হলো। ছেলেটা বিয়ে করতে চাইছিলো না। চাব্‌কে চাব্‌কে ওর পিঠটা লাল করে ছাড়লাম। কই, কারুর সাহস হলো আমাকে বাধা দেবার! আমার মুখের ওপর কথা বলতে সাহস পেলো কেউ? মেয়েটাকে বিয়ে করতে বাধ্য হলো।"

—"আচ্ছা, এখানকার মঠ, মন্দির, স্তূপ থেকে নাকি মাঝে মাঝে এটা-ওটা চুরি হচ্ছে?" প্রশ্ন করে সুপ্রিয়।

—"হচ্ছিলো। আমি সতর্ক দৃষ্টি রেখে সবকিছু বন্ধ করিয়েছি। আমি সর্বপ্রথম প্রত্নতত্ত্ব বিভাগকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম।"

—"তাহলে মূর্তি চুরি বন্ধ হয়েছে?"

—"হয়েছে। ভারতের খাজুরাহো, কোণারকে শৃঙ্গার রসাবিষ্ট নায়ক-নায়িকার রতিবদ্ধ মূর্তির জন্য আন্তর্জাতিক চোরেরা কি না করেছে! ভারতের মঠ মন্দির থেকে দেদার মূর্তি উধাও হয়েছে। ব্যাটারিতে চালানো এক ধরনের পাথর কাটা আধুনিক করাতের সাহায্যে মন্দিরের গা থেকে মূর্তিগুলো একেবারে নিখুঁত অবস্থায় কেটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। এখানেও এ চেষ্টা হচ্ছিলো। কিছুদিন কর্তারা ল্যাজেগোবরে হচ্ছিলো। এখন এসব বন্ধ হয়েছে। রাজগীরে এর জন্যে কি আমি কম খেটেছি!"

—"এবার আমি উঠি।" সুপ্রিয় গোবর্ধনবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজ ঘরের দিকে পা চালিয়ে দেয়।

* * *

খবরের কাগজে খবরটি ছোট্ট, একরত্তি। কিন্তু ভারী ইন্‌টারেস্টিং। মোটেও উপেক্ষণীয় নয়। গোবর্ধনবাবুর বোর্ডিং-হাউসের ঘরে বিছানায় শুয়ে রাত্রিবেলা সুপ্রিয় খবরটা পড়ছিলো। বন্ধু প্রশান্ত কল্‌কাতা থেকে সুটিং-এর ব্যাপারে রাজগীরে এসে পৌঁছেছে। তাকে রেস্ট্‌ হাউসের ঘরটা ছেড়ে দিয়ে সুপ্রিয়র এসে গোবর্ধনবাবুর এ বোর্ডিং-হাউসে উঠ্‌তে হয়েছে। সুপ্রিয় বলেই গোবর্ধনবাবু তার অন্দরমহলে দোতলার একখানা ঘর ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছে। অন্য কেউ হলে গোবর্ধনবাবু রাজী হতো না। অল্প কিছু দিনের মধ্যে সুপ্রিয়র সঙ্গে গোবর্ধনবাবুর একটা মনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সাংঘাতিক স্থানাভাব। তবুও গোবর্ধনবাবু এ ব্যবস্থাটুকু করতে পেছ-পা হয়নি।

গোবর্ধনবাবু দোতলা বাড়িটাতে নিজে থাকে। বোর্ডিং-হাউস্ থেকে এর দূরত্ব বেশ খানিকটা। জায়গাটা বেশ নির্জন। আশে-পাশে লোকজনের ভীড় নেই। একফালি বাগানের পরই শালবন সুরু হয়েছে। খবরের কাগজে সুপ্রিয়র দৃষ্টি নিবদ্ধ। বেশ কয়েকদিন আগে রাজগীরের পাহাড় অঞ্চলে মাটি খুঁড়ে নাকি এক বিঘৎ লম্বা একটি সোনার বুদ্ধমূর্তি কোন এক ব্যক্তি আবিষ্কার করেছিলো।

মূর্তিটি যে অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছিলো, কিংবদন্তী, তারই কাছে নাকি বিম্বিসারের স্বর্ণভাণ্ডার ছিলো। যে ভদ্রলোক মূর্তিটি পেয়েছিলো সে নাকি গোবর্ধনবাবুর বোর্ডিং-হাউসের বাসিন্দা ছিলো। মূর্তিটি নাকি সে গোবর্ধনবাবুকে দেখিয়েছিলো। সংবাদে বলা হয়েছে স্বর্ণবুদ্ধমূর্তিটি নাকি চুরি হয়েছে।

স্বর্ণমূর্তি আবিষ্কারের কয়েকদিন পরে পুলিশের পোশাক পরা জনাচারেক লোক এসে সেই ভদ্রলোক যে স্বর্ণমূর্তি আবিষ্কার করেছিলো তাকে নাকি জীপে উঠ্‌তে আদেশ দেয়। মূর্তি সম্বন্ধে থানায় বসে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন হয়েছে বলেই তাকে ওরা থানায় নিয়ে যেতে এসেছিলো। সন্ধ্যের পরই এ ঘটনা ঘটে। ভদ্রলোক ইতস্ততঃ করছে দেখে পুলিশের লোকেরা চোখ রাঙায়। সরকারি নিয়মকানুন পড়ে শোনায়। এরপর পুলিশের লোকেরা ভদ্রলোকটিকে জীপে তুলে চলে যায়। অর্ধেক পথ গিয়ে মূর্তিটি নিজেদের কাছে রেখে ভূয়ো পুলিশের লোকেরা চম্পট দেয়। ভদ্রলোক থানায় গিয়ে জান্‌তে পারে যে, পুলিশের তরফ থেকে কোনো লোককে তার কাছে পাঠানো হয়নি। ভদ্রলোক কেস্‌টি থানায় ডায়েরী করিয়েছে।

এরপর আরো মজার ঘটনা ঘটেছে। ভদ্রলোক নিজেই এবার নিখোঁজ হয়েছে। পুলিশ ঘটনাটি সম্বন্ধে তদন্ত চালাতে গিয়ে নাজেহাল হচ্ছে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এ ব্যাপারে যথেষ্ট সজাগ। তাদেরই চাপে পুলিশ-বিভাগ আরো বেশি কর্মতৎপর হয়ে উঠেছে। সারা শহরে এ সব নিয়ে একটা চাপা উত্তেজনা। সুপ্রিয় কাগজটা পাশে রেখে ঘুমোবার চেষ্টা করে। অনেক রাত হয়েছে, বাইরে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক, শেয়ালেরা ঐকতানবাদন সুরু করেছে। শালবনে সূচীভেদ্য নিবিড় জমাট অন্ধকার। ধীরে ধীরে সুপ্রিয় ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে।

কতোক্ষণ সুপ্রিয় ঘুমিয়েছিলো তা সে জানে না। হঠাৎ তার ঘুমটা ভেঙে যায়। দোতলার জানালা দিয়ে সে বাইরে তাকায়।

চারদিকে নিকষ্ কালোর পরদা। কিন্তু ওটা কি? শালবনের ভেতর থেকে একটা টর্চের আলো উঠে এসে মাঝে মাঝে একতলার ঘরের জানালায় গোত্তা খেয়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে কেউ যেন একটা টর্চলাইট্ মাঝে মাঝে জ্বাল্‌ছে আবার পরক্ষণেই নিভিয়ে ফেল্‌ছে। কে টর্চ জ্বালাচ্ছে? আবার কে-ই বা সেটা নেভাচ্ছে? কে শালবনের ভেতর দাঁড়িয়ে থেকে এ কাজ করছে? এ গভীর রাতে শালবনের ভেতর ঢোক্‌বার কার সাধ জাগ্‌লো? কি ওর উদ্দেশ্য? সুপ্রিয়র মনে নানা প্রশ্ন। সুপ্রিয় ততোক্ষণে বিছানায় উঠে বসেছে। উঠে বসে গায়ের জামাকাপড় ঠিক্‌ঠাক্ করে নিয়েছে। এক বিস্ময়ের পর আর এক বিস্ময়। দোতলা বাড়ির নীচতলার জানালা থেকে এবার দ্বিতীয় ব্যক্তি টর্চের আলো শালবনের উদ্দেশ্যে যেন ছুঁড়ে দিলো। চক্রাকারে আলোটা ঘুরছে। আলোটা জ্বল্‌ছে আর নিভ্‌ছে। নীচের ঘরে তো গোবর্ধনবাবু শুয়ে রয়েছে। সুপ্রিয়র মনে চিন্তার মেঘ। সুপ্রিয়র মনে হলো ছুটো আলো যেন নিজেদের মধ্যে সঙ্কেত বিনিময় করছে। সবকিছু যেন কি রকম অর্থপূর্ণ। মনে হয় এ যেন প্রশ্ন-উত্তরের খেলা চল্‌ছে। সুপ্রিয় নিঃশব্দে এসে জানালার ধারে দাঁড়ায়। সবকিছু যেন রহস্যে ঘেরা বলে মনে হচ্ছে। সুপ্রিয় বাড়িটার নীচতলার দিকে দৃষ্টি ফেলেছিলো। হঠাৎ দেখতে পেলো গোবর্ধনবাবু যে ঘরে রয়েছে সে ঘরের দরজা খুলে গভীর অন্ধকারের ভেতর একটি মূর্তি পা টিপে টিপে এগিয়ে যাচ্ছে। সুপ্রিয় তার দৃষ্টিশক্তিকে যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ ও সতর্ক করে তোলে। এটুকুন্ সে বুঝতে পারে পা টিপে যে ধীরে-সুস্থে চলে গেলো সে পুরুষ নয়, সে নারী এবং তার দেহে একখণ্ডও বস্ত্র নেই। জামাকাপড় হাতে ধরা রয়েছে বলে মনে হলো। মূর্তি বারান্দায় উঠে অন্য ঘরে ঢুক্‌লো। এরপরে বেরুলো গোবর্ধনবাবু। সদর দরজার দিকে না গিয়ে গোবর্ধনবাবু সতর্ক পা ফেলে খিড়কিত্নয়ার খুলে বেরিয়ে গেলো। স্পষ্ট বোঝা গেলো তার গতি শালবনের দিকে।

এর ভেতর শালবন থেকে আলো উঠে এসে একতলার জানালায় কয়েকবার সঙ্কেত বুলিয়ে গেছে। বিরাট এক কৌতূহল সুপ্রিয়কে যেন গিলে খাচ্ছে। সেও এক সময় নিজের টর্চটা জামার পকেটে ফেলে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যায়। কৌতূহলের অবসান্ হওয়া দরকার।

শালবনের সূচীভেদ্য অন্ধকারের ভেতর আত্মগোপন করে একটা বিরাট গাছের পেছনে সুপ্রিয় দাঁড়িয়ে ছিলো। হঠাৎ গোবর্ধনবাবুর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

—"তুমি কেন এসেছো? এই তো এতোগুলো টাকা সেদিন আমার কাছ থেকে তুমি নিয়ে গেছো। আর কতো টাকা দেবো তোমাকে?"

—"যে আন্দাজ পরিশ্রম করেছি তার তুলনায় এ পারিশ্রমিক্ কিছুই নয়। আরো অনেক টাকার দরকার আমার। আপনি অনেক টাকা কামাচ্ছেন। আপনার বোর্ডিং-হাউস্ ফুলে-ফেঁপে উঠেছে।"

এক অপরিচিত কণ্ঠস্বর।

—"কে তোমাকে বললো যে, আমার কাছে টাকার পাহাড় জমেছে?" গোবর্ধনবাবু প্রশ্ন করে। রুদ্ধ নিশ্বাসে শুন্‌ছে সুপ্রিয়।

—"এসব খবর পাখ্‌নায় ভর করে বাতাসে উড়ে বেড়ায়।" আবারো অপরিচিত পুরুষের কণ্ঠস্বর।—"রাজগীর সহরের হাল তো চোখেই দেখতে পাচ্ছি। ফুলে-ফেঁপে একাকার। লোক গিজ্‌গিজ্ করছে। আপনার বোর্ডিং-হাউসে স্থানাভাব। এতো অর্থ পাচ্ছেন, আমাদের কথা ভাবুন একবার!"

—"বলতে পারো আমাদের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে এবং তার জন্যে আমি তোমাকে ভালো অর্থই দিয়েছি।" বলে গোবর্ধনবাবু।

—"যে আন্দাজ আমার মেহনত্ গেছে তার তুলনায় এ অর্থ কিছু নয়। পেতলের বুদ্ধমূর্তির উপর সোনার কাজ করা হয়েছে। বুদ্ধমূর্তিকে রাতের অন্ধকারে মাটির নীচে পুঁতে রাখতে হয়েছে।

লোকজন জড়ো করে তাদের চোখের সামনে মাটি খুঁড়ে মূর্তি বের করতে হয়েছে। তারপর এই সোনার মূর্তি আবিষ্কার-কাহিনী কৌশল করে জেলা, গ্রাম, মহকুমা, সহর, হাটে বাজারে ছড়াতে হয়েছে। জোর পাব্লিসিটি দিতে হয়েছে। গুপ্তধন সম্বন্ধে জোর পাব্লিসিটি না দিলে এতো লোক রাজগীরের পথে ছুটতো না। রাতারাতি রাজগীর লোকে ভরে উঠতো না। আপনার হোটেল ব্যবসার প্রসার এতো হতো না।"

—"তার জন্যে আমি প্রচুর অর্থ ঢেলেছি।"

—"কতো অর্থ আর ঢেলেছেন? যে পরিমাণ শারীরিক্ পরিশ্রম আর মানসিক্ ক্লেশ গেছে তার তুলনায় ও অর্থ কিছুই নয়। বুদ্ধি খরচ করতে হয়েছে প্রচুর। সাবধান হয়েছি তার তুলনায় অনেক বেশি। পরিশ্রমের চূড়ান্ত। লোকগুলো ট্যুরিস্ট আর তীর্থযাত্রীর ছদ্মবেশে এসে গুপ্তধন খুঁজে বেড়াচ্ছে—। বনবাদাড়ে, অরণ্য পাহাড়ে ঘুরছে আর ঘুরছে। কিসের লোভে? ওই গুপ্তধনের আশায়। এ ক'দিনের ভেতর রাজগীরে এতো ভীড়! বলুন দেখি কি পেলাম? কতোটুকুন্ পেলাম? পুলিশ আমার পেছনে ঘুরছে। আত্মগোপন করে আছি। আপনি আমাকে কি দেবেন খুলে বলুন?"

—"আমাকে একদিন সময় দাও। আমি একটু ভেবে দেখি।" বলে গোবর্ধন বাবু।

—"না, সময় দিতে আমি রাজী নই।" লোকটি উত্তর দেয়। আবার সে বলে—"ফয়সালা এখন এই মুহূর্তে করতে হবে।" সুপ্রিয় আর শুনতে পারেনি। পা টিপে টিপে চোরের মতো পালিয়ে এসেছে সেখান থেকে।

*   *   *

পরের দিন সকাল বেলা সারা রাজগীরে দারুণ উত্তেজনা। গোবর্ধনবাবু অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে খুন হয়েছে।

আততায়ী নাকি গোবর্ধনবাবুর ভোজালীটাই ব্যবহার করেছে। সুপ্রিয় জানতে পারলো লাশ্টা শালবনের ভেতরই পড়ে রয়েছে।

আরো পরের ঘটনা, আততায়ীকে পুলিশ ধরতে পারেনি।

সারা সহরে ইস্তাহার আর বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি। স্বর্ণবুদ্ধ মূর্তির ব্যাপারটা যে আগাগোড়া প্রতারকের, লোক ঠকানোর ব্যাপার সে সম্বন্ধে হুঁশিয়ারী ছাড়া হয়েছে। সহরের লোক, ট্যুরিস্ট, তীর্থযাত্রীরা যেন দয়া করে এ ব্যাপারে বিভ্রান্ত না হয়। কে করলো এটা? আততায়ী, না সুপ্রিয়?

শেষ